কবি

লিটিল কবিতাপত্র

একুশ সংখ্যা
২০২২

সম্পাদক
র. আমিন

প্রচ্ছদ
সংগৃহীত

প্রকাশক
Amazon.com Inc., USA

সম্পাদকীয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় ও তাৎপর্যবহ দিন। ১৯৫২ সালের আজকের এ দিনে ভাষায় জন্য বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, পেশাজীবী, কৃষক, মজুর সহ সর্বস্তরের জনগন ঢাকার রাজপথে নেমে এসেছিল। পুলিশের গুলিতে জীবন দিতে হয়েছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার সহ অসংখ্য তাজা প্রাণ। আর তারই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা অর্জন করেছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা'- ভাষা সৈনিকের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে এ আমাদের গর্বিত বিজয়। সেই গর্বিত বিজয় নিয়ে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস- '**মোদের বর্ণমালা**'।

কবিতা

জহুরুল আলম - ৪
আমি বাঙালি

শঙ্কর তালুকদার - ৫
ভাষা-অভিমান-অহংকার

আহমেদ মাসুদ ইকবাল - ৬
অ আ ক খ

বর্ণ - ৭
অশ্রুধারার খেলা

ফুয়াদ স্বনম - ৮
'২১ ও সালাম,রফিক,বরকত,জব্বার'

সাফিকা জহুরা জেসী - ৯
ভুল অধ্যায়

কাজী মিরা - ১০
একুশ আমার অহংকার

জাভেদ পলক - ১০
স্বপ্নময়ী যৌবন

মহিউদ্দিন আহমেদ - ১১
প্রাণের বর্ণমালা

রাজ পথিক - ১২
একুশ মানে

সাইয়েদ করিম - ১২
বসন্ত ও একুশ

নীলোৎপল বসু - ১৩
কবর আছে

রাণা চ্যাটার্জী - ১৩
ভালোবাসি বাংলা

গল্প

আহমেদ মাসুদ ইকবাল - ১৫
অর্বাচীন সংলাপ

শহীদুল হক বাদল - ১৯
খেলাঘর

প্রবন্ধ

অধ্যাপক ড. জহুরুল আলম - ২৪
ভাষা আন্দোলন :
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়

শঙ্কর তালুকদার - ৩৩
ভাষার লড়াই বিশ্বজুড়ে,
বাংলার লড়াই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে!

র.আমিন - ৪০
বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে

অঙ্কন ও ফটোগ্রাফি

শাহরিনা চৌধুরী - ৪৩
কাবেরী আক্তার - ৪৪

কবিতা

জহুরুল আলম
আমি বাঙালি

আমি বাঙালি।
চির শাশ্বত বাংলা মায়ের
গর্বিত সন্তান,
তোমার কোলে জনম আমার
তোমাতে জুড়াই প্রাণ,
হে মাতা মোর, বঙ্গ জননী
তুমি চির অম্লান।
হাজার বছর জুড়ে বিকশিত
জননী সুমহান,
শত নদী-নির্ঝরে আবৃত
সমতল বিতান,
তোমার পায়ে অর্ঘ্য-প্রণতি
হে মাতা অম্লান,
বাঙালি আমি, বাংলা মায়ের
গর্বিত সন্তান।
আমি বাঙালি, বাংলা মায়ের
গাহি সদা জয়গান,
সীমার বাঁধনে আবদ্ধ কোন
একদেশী শুধু নই,
মাথা নত করা পালিয়ে বেড়ানো
যাযাবর আমি নই,
সারা বঙ্গ আমার জননী,
বাংলার সন্তান-
আমি বাঙালি, বাংলা মায়ের
গর্বিত সন্তান।
বক্ষে বাংলা ধারণ করি,
বাংলা মাতারে অর্ঘ্যে ভরি,
বাংলা ভাষায় লিখি, কথা বলি,
গাহি বাংলার গান,
পৃথ্বীর যেথায় যখন থাকি,
গাহি মাতার জয়গান,
আমি বাঙালি, বাংলা মায়ের
গর্বিত সন্তান।
কে আছে ভবে পদানত করে ?
আমার পতাকা নমিত করে ?

মোর ভাষারে অবনমনে
চালায় আগ্রাসন ?
জেনে লও, চিরঞ্জীব এ ভূমি
অজেয় অম্লান।
কেহ কোনদিন মোর পরিচয়
না করিবে ম্রিয়মান,
আমি বাঙালি, বাংলা মায়ের
গর্বিত সন্তান।

শঙ্কর তালুকদার
ভাষা-অভিমান-অহংকার

লিপি-অক্ষর-বর্ণ ও শব্দমালা যে বোঝে না স্বাধীনতা -
তারা শুধু বোঝে জলজংলা প্রাণ, সবুজ হৃদয়ের বার্তা
তারা যে বোঝে নদী ও মাঠে প্রাণের গান ও পাখির ডাক
মোটা কাপড় আর ভাতেই তাঁরা মাটির ভাষায় রয় সজাগ !
না বলা কথায় মুক্ত মনে তাই উচ্চারে যে সেই অধিকার-
মাটি ও জল সাক্ষী রয়েছে মানুষের ভাষা একুশে আর;
জলের রঙে, সময়ের কাছে দেশ কাল মাটিতে চিহ্ন তার
পদ্মা-মেঘনা-গঙ্গার টানে যে ভাষা জেগেছে এ বাঙলার!
দেশের সীমা পার করেছে তাই বিশ্ব মানের জোসনায়-
শালুক-পদ্মে শব্দমালায় সে জলজংলা আর নদীনালায়!
ফিরে আসে সেই ভাষার মেরাপ অক্ষর খুঁড়ে বারংবার-
২১'এর মাঠ ১৯'এর রাস্তা, সে ভাষা লড়াইএর অহংকার!

আহমেদ মাসুদ ইকবাল
অ আ ক খ

(এক)
বাহান্নর দিনগুলি ছিলো -
ছেলেহারা মায়ের অশ্রুভেজা।
দামাল ছেলেরা যে জীবন বাজী রেখে-
রাজপথে ছিলো শ্লোগান মুখর।
ওরা কেড়ে নিতে চায় মায়ের মুখের ভাষা।
ওরা চেপে ধরতে চেয়েছিল আমাদের কন্ঠনালী।
ওরা জানতনা বাঙগালী জীবন বিলায় !
প্রতিবাদ ! ওটা হলো বাঙগালীর অহংকার।
জীবনের বিনিময়ে আমরা সে কথা -
বুকের তাজা রক্তে লিখে রাখি।
আমাদের প্রতিবাদী ভাষাসৈনিক -
রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত,
আরও অনেক নাম।
ওরা সেদিন -
বুকের রক্ত ঢেলে গেয়েছিলো -
বাংলা ভাষার গান বিশ্বসভায়।
আমরা ঋণী তোমাদের কাছে,
তাই আমরাও গাই প্রভাতফেরির গান -
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙগানো,
একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।'

(দুই)
আমাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে
এই পৃথিবীর মানচিত্রে
আমরাই লিখে রেখে দিয়েছি -
আমাদের মা'য়ের মুখের ভাষা।
বিশ্ব সভায় সেতো এক ইতিহাস
মা'য়ের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে -
দেয়নি বাংলা মা'য়ের সন্তান।
ভাষার অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী
আমরাই সেই বাঙ্গালী জাতি,
পৃথিবীর মানচিত্র রাঙানো
আমাদের রক্তের রঙে
ফিরে আসে একুশে ফেব্রুয়ারি।
আমাদের বসন্ত দিনে -
শুধু তোমাদের কথা বলতে।
তাইতো একুশ আমার অহংকার॥

বর্ণ
অশ্রুধারার খেলা

আজ অবধি ভালোবেসে-
একলা কেবল আমি,
খানিক আগে বুকের রক্তে-
তোমায় আঁকছিলাম,
জানিনে তাও কেন তাহার -
দাওনা কোনো দামই,
এমন ভালোবাসার আমি -
পাইনি কোনো নাম।
একটিবারও চাওনি ফিরে-
দুঃখ দেবার বেলা,
যাবার আগে বারেক তুমি -
ভালোবাসাই দিও,
বন্ধ করে তোমার এমন -
অশ্রুধারার খেলা,
যখন যাবে তখন না হয় -
ফিরে ফিরে চেও।
যৌবনের এই আবেগটুকু-
ছাঁকনি ছাঁকা ছাঁকা,
তাতে আমার তিলেক মাত্র -
পঙ্কিলতাও নাই,
ওই কাগজে ভালোবাসার -
নকশা ছিলো আঁকা,
যারে তুমি অসার ভেবেই -
করলে পুড়ে ছাই।
এখন'ত প্রেম করলে নাগো,
তখন না হয় করো,
তখন না হয় অসঙ্কোচেই -
ধরবে আমার হাত,
মরতে যখন দু'দিন বাকি,
আমরা বুড়ি-বুড়ো,
ভালোবেসে কয়েকটা দিন,
করবো না হয় পাত।

ফুয়াদ স্বনম
'২১ ও সালাম,রফিক,বরকত,জব্বার'

ওখানে কে ?
কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?
পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিলো !
ওরা কারা ?
এক ঝাঁক সূর্য ?
না-না তা কি করে হয় ?
সূর্যতো পশ্চিমে অস্ত যায় !
এরা তো অস্ত যাবে বলে উদয় হয়নি !
কারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে করে সিনাটান ?
তবে, কোথা থেকে ভেসে আসলো
দ্রিম-দ্রিম দোনলা রাইফেলের গুলির শব্দ ?
কারা চালালো বন্দুক ?
কাদের রক্তে ভিজে গেলো বুক ?
কাদের গা থেকে ভেসে আসছে
কার্তুজ পোড়া গন্ধ ?
ফিনকি দিয়ে বাঁ পাঁজর হতে রক্ত ছুটছে
অথচ, ওদিকে কারা যেন "মাগো মাগো"
করে কৎরাচ্ছে ! ওরাইবা কারা ?
কাদের এতো সহ্য ক্ষমতা ?
এতোটা প্রেমিক তারা কি করে হলো ?
নারী, অর্থ, ধন, দৌলত কিসের প্রতি
তাদের এ লোভ ?
কোন লোভের খেসারত দিতে গিয়ে
আজ তারা প্রাণ হারাচ্ছে ?
কাদের শেষ দীর্ঘনিশ্বাস
এ মাটির খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে ?
কার মাথার মগজ রাস্তায় ছিটকে পড়ে আছে ?
আর তাতে 'অ' 'আ' 'ই' কে খোদাই করে লিখেছে ?
ওরা কি ১৪৪ ধারা শোনেনি ?
ওরা কি কি ঘটতে পারে সেদিন
একবারও ভাবেনি ?
পাক হানাদার বাহিনীর নামটা শুনে কেনইবা
শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল ঘাম চুঁয়ে পড়েনি তাদের ?
এরা কি কারোর সন্তান ছিলো না ?
বা কারো বাবা-ভাই-স্বামী ?
তাদের মানিব্যাগে কাদের ছবি রাখা থাকে ?
তাদেরও কি সংসার, সংসারের মায়া ছিলো না ?
প্রাণের প্রতি দয়া ছিলো না ?
তারাও কি কারো বিশ্ব ছিলো না ?

তাদের ঘিরে কারোর স্বপ্নিল দুনিয়া ছিলো না ?
প্রাণের মায়ায় কেন তারা বলেনি-
কেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বিকার করেনি-
'হাম ঊর্দুমে শোতে হ্যায়'
'হাম ঊর্দুমে জাগতে হ্যায়'
'হাম ঊর্দুমে রোতে হ্যায়'
'হাম ঊর্দুমে হাসতে হ্যায়'.....
অথচ, কি আশ্চর্যভাবে ওরা মৃত্যু মুহুর্তেও
বলে গেলো...."মাগো মাগো, আমি আসছি মা।"
শুনেছি মৃত্যুমুখে মানুষ সত্য কথা বলে---
"মোদের গৌরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাঙলা ভাষা ।"

সাফিকা জহুরা জেসী

ভুল অধ্যায়

আমি জানি, তুই আমার জীবনের আরেক ভুল অধ্যায়
যদি তোকে নিয়ে লিখি, যদি তোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি,
আরও এক ভুল পথে যাত্রা শুরু হবে আমার !
সব জেনেও, মন কেন এতো অবুঝ ?
কোন যুক্তি, কোন বাস্তবতা গড়তে পারছে না প্রাচীর !
একটা একটা করে যখন সব হাত ছুটতে থাকে,
তখন আঁকড়ে ধরে মন মিথ্যে আশ্বাসের খুঁটি,
কে না চায় বাঁচতে, কে না চায় ভালো থাকতে !
সঠিক ভুলের হিসেব করে, এতো সচেতনভাবে চলে,
প্রাপ্তি যখন কেবল হতাশা আর বিফলতা;
তখন বুকের চাপা কষ্টের পাহাড় ভাঙার মতো
মজবুত একটা হাত চাই, মজবুত একটা ঠিকানা !!
কিন্তু, আমি জানি, তুই আমার জীবনের আরেক ভুল অধ্যায়
যাকে পড়তে পড়তে , নিজের মতো করে গড়তে গড়তে
হয়তো পুরোটা জীবন ফুরিয়ে যাবে পাতা উল্টাতে উল্টাতে;
এলোমেলো বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে আমার সাজানো পান্ডুলিপি
তবুও হয়তো বিমুখ হতে পারবো না কোনদিন !
কেন মানি না, তুই আমার জীবনের আরেক ভুল অধ্যায় ;
যে কিনা কেবলই কাঁদিয়ে যায় !
কেবলই দুঃখ হয়ে সুখের রাজ্যে রোজ স্বপ্ন দেখায় !
স্বপ্ন দেখায় ঘর বাঁধবার ;
যে ঘরের চার দেয়ালে কেবলই শ্যাওলা আর ছত্রাকের বাস !
ধুয়ে মুছে নতুন করে জীবন সাজাতে সাজাতে
কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে, কবি নেবে চিরতরে বিদায় !
তবুও তোকেই পড়ি! তোকেই গড়ি! সত্য মেনে নিয়ে---
"তুই আমার জীবনের আরেক ভুল অধ্যায়! "

কাজী মিরা
একুশ আমার অহংকার

ভাষার জন্য দিয়েছে প্রাণ
সালাম-রফিক-জব্বার
একুশ আমার অহংকার ।

ফিরে পেয়েছে বাঙলা আজ,
গর্বিত শহীদ মিনার,
দাড়িয়ে আছে বিশ্বময়,
একুশ আমার অহংকার ।

পল্লবে পল্লবে একুশ আজ,
পালকে পালকে একুশ আজ ,
বাংলার আনাচে-কানাচে ,
ছড়িয়ে আছে বিশ্বময় ।
একুশ আমার অহংকার ।

জাভেদ পলক
স্বপ্নময়ী যৌবন

প্রদীপ দেব ধরিয়ে,
শেষ অবধি রমনীর দরজার
শেষ কটা ধাপ পেরিয়ে,
বুকের শিশীর ভিজা স্বপ্ন হবে সত্য।
যদি সাজ সন্ধ্যায় জোনাকিরা না বাসে ভালো,
তোমায় পাবো বলে প্রদীপ দেব ধরিয়ে।
ষোড়শী এসে বলবে,
‘বীর তোমার আশ্রয়দাতা ক্ষমার অযোগ্য।’
তুমি এসো মোর হৃদয়ের আনন্দ উল্লাসে।
রাতের মেঘ বলেছে,
আমি যেন ভালোবাসার কথা
কবিতায় জীবন্তরূপ দিয়ে বলি তোমার প্রানে।
আমি স্বপ্নময়ী যৌবন,
ভালোবাসার রূপক
জ্বালা নিবারক রূপসী কন্যা।
এসো, মোর সাথে মোর প্রান সখা,
হিংস্রতার গ্লানি ভুলে এসো
মোর তরে নুতন সাজে সজ্জিত হয়ে।
ওঃ ! হৃদয় মাঝে নিবে আমায় নিজের মত করে।

মহিউদ্দিন আহমেদ
প্রাণের বর্ণমালা

কতো ফাগুন পার হয়ে গেল
খোকা তুই আজও এলিনা,
বলেছিলি-
দেখো মা, তোমাকে একটি দুষণমুক্ত শব্দের
ঝলমলে দিন উপহার দেবো ।
উপহার দেব শুদ্ধতম পূরবী রাগের সন্ধ্যার তাণ,
আরও এনে দেব নতুন নতুন সুরের
মায়াভরা হাজার তাণের মিশ্ররাগের ঘুমপাড়ানি গান ।
জানিস খোকা-
আকাশের দিকে আমি আজকাল মোটেই তাকাই না,
কেমন জানি অদ্ভুত একটা জ্বালা ধরে যায় আমার দু'চোখে ।
গোধূলির রাঙা আকাশ যেটা ছিলো তোর খুবই পছন্দ,
রক্ত-লালাভ আভা দেখে
কেমন যেনো আমার বুকে কাঁপন ধরে যায় ।
দূর আকাশের ঐ লাল রংটা মনে করিয়ে দেয় -
একটি রক্তে ভেজা জামা ।
যেটা এখনো জমা আছে
আমার বুকের রক্তে আঁকা স্মৃতির আলমারির নিভৃত কোণায় ।
উঠানের পাশের পলাশের গাছটা এখন রীতিমত সবচেয়ে বড়ো বৃক্ষ,
ফুলে ফুলে ভরে যায়,
লালে লাল হয়ে যায় আমাদের আঙ্গিনা ।
উঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাপড়ির লালস্তুপ
কোনোদিনই আমি ঝাড় দেইনা,
কেমন যেন একটা ভেজা-ভেজা রক্তের ঘ্রাণ খুঁজে পাই ।
চারিদিকে এখন শুধুই বিজাতীয় শব্দের দুষণ,
ব্যাঙের হাসি, কুমিরের অশ্রু,
কাকের কর্কশ কা-কা ডাকে কান ঝালাপালা,
মুখ লুকিয়ে বোবা চোখে কাঁদে
তোর রক্তে ভেজা প্রাণের বর্ণমালা ।

রাজ পথিক

একুশ মানে

একুশ মানে আমার কাছে
সংগ্রামে ফোটা কলি,
একুশ আমার মায়ের কাছে
প্রথম শেখা বুলি।
একুশ মানে শহীদ ভাইয়ের
বুক পেতে নেয়া গুলি,
একুশ আমার বাঙলা ভাষার
শাশ্বত রংতুলি।
একুশ মানে আমার মায়ের
বুকের পাঁজর ছেঁড়া,
একুশ আমার বিদ্রোহী ভাইয়ের
লোহিত কণিকা ধারা।
একুশ মানে আমার চোখে
স্বপ্নের রাঙাপ্রভাত,
একুশ আমার মাতৃভাষার
প্রতিবাদী প্রতিঘাত।
একুশ মানে বুকের মাঝে
মাতৃ মমতার টান,
একুশ আমার অহংকারের
সাম্যের জয়গান।

সাইয়েদ করিম

বসন্ত ও একুশ

বসন্তের মধ্যরজনী
দুর হতে ভেসে আসছে রজনীগন্ধ্যা
আর শিউলী ফুলের গন্ধ।
নিশাচর পাখির দু`একটা ডাক,
ঝিরঝিরে বাতাস, বসন্তের সমীরণ।
কোলাহলহীন কী দারুন স্তব্ধ সারাটা প্রকৃতি,
আহা কী আনন্দ ! উপলব্ধির কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা !
অনুভুতির ডালাগুলো যেন মেলে উড়ছে-
ফাগুনের বাতায়নে।
একুশের সমস্ত অস্তিত্ব যেন
ফাগুনের হাওয়ায় মত্ত।
একুশের গানের ভেলায় ভাসছে তরী
হৃদয়ে কম্পন জাগায় অধিকারের মর্মবানী।
হলদে পাখি কানে কানে বলে দিচ্ছে
একুশের জয়গান গাও।।

নীলোৎপল বসু
কবর আছে

কবর আছে,
একুশের বিষণ্ণতার কবর আছে -
হয়তো এখন আধুনিকতা খুব ছোয়াচে,
তবু খবর আছে,
এই বাংলা আজও এখনও নিজেই বাঁচে।
শহর যখন ঘুমিয়ে পড়ে মধ্যরাতে,
পিছিয়ে যেও সময় যন্ত্র নিয়ে হাতে,
প্রতিফলনের সূত্র মেলাও ঝাপসা কাঁচে,
দেখবে খবর আছে,
এই বাংলা আজও কিন্তু নিজেই বাঁচে।
জ্বালবো কোথায় আগুন,
সব মুখোশ ঢাকা চোখ,
এ যেনো বারুদ নিয়ে খেলা,
আগে ভেতর শান্ত হোক ।
এ এক উল্টো স্রোতের কথা,
বিপ্লবী কোনো ধাঁচে,
তবুও তুমি যেনো,
বাংলা নিজেই কিন্তু বাঁচে ।

রাণা চ্যাটার্জী
ভালোবাসি বাংলা

বাংলা আমার মাতৃভাষা,
অনেক আদর,অনেক আশা।
এই ভাষাতেই মা'কে ডাকি ,
বাংলা পড়তে দিইও ফাঁকি।
জন্ম থেকেই এই ভাষাকে ,
শিরায় শিরায় আগলে রাখি।
এমন অনেক মহান ছেলে,
অন্য ভাষায় রপ্ত হলে ,
বেমালুম যায় বাংলা ভুলে,
যেমন পালায় মা'কে ফেলে!
অক্ষমতার কারণ তুলে,
আজকে তারাই ফাটিয়ে গলা,
অমর শহীদে দেয় জয়মালা।
বাংলা আমার জন্মভাষা,

জন্মভূমি ভালোবাসা।
আমার হৃদয়,আমার আবেগ
সবকিছুতেই বাংলা ভাষা।
এই ভাষাতেই মিষ্টি ছোঁয়া,
মায়ের স্নেহ,উতল হাওয়া ।
বঙ্গ আমার,জননী আমার,
বাংলা ভাষা তোমার আমার।

গল্প

আহমেদ মাসুদ ইকবাল
অর্বাচীন সংলাপ

'আমি শুনেছি সেদিন তুমি
সাগরের ঢেউয়ে চেপে
নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো. . . . .'

দু'চোখ ভরে সমুদ্র দেখার ভাগ্য হয়নি মেয়েটির, মেয়েটির নাম নদী। অবশ্য সীমান্ত কতদিন বলেছে,
- নদী চলো সমুদ্রে বেড়িয়ে আসি. . . . .
কিন্তু নদীর মনের ভেতরে একটা সংকোচের দেয়াল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয় বন্ধু সীমান্তের সেই উদাত্ত আহ্বান উপেক্ষিত রয়ে গেল নদীর কাছে। আজ গানটা শুনতে শুনতে সমুদ্রের নীল জলের হাতছানি কোনমতেই নদী আর উপেক্ষা করতে পারলে না। কোথায় সীমান্ত ? সীমান্তকেই আজ যেন বড্ড বেশি দরকার নদীর। অনেকটা সময় গড়িয়ে গেছে। সীমান্ত এসে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নদী'দের বসত বাটি'র উঠানে গজিয়ে ওঠা জারুল গাছের সাথে হেলান দিয়ে। দখিনের খোলা জানালায় চোখ পড়তেই নদী দেখতে পেলে তার কাঙ্খিত অপেক্ষমান প্রিয়জনকে। বলা নেই কওয়া নেই নদী দৌড়ে এসে সেই কবেকার বাড়িয়ে দেয়া সীমান্তের হাতটি মনের সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দুচোখ বুজে আঁকড়ে ধরেছে সমুদ্র দেখার আনন্দে। নিজের আবেগ সম্বরণ করে কোনরকমে সীমান্তকে বললে,
- চলো সীমান্ত, আজ আমাকে নিয়ে চলো সমুদ্রে।

নদী জানে সীমান্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে তার কথা শুনে। তাই সীমান্তকে কোন কথা বলতে না দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে ছুটতে শুরু করলো পশ্চিমমুখী সরকারি রাস্তা ধরে বিরামহীন। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চাকমা আর মারমাদের বসতিকে পাশ কাটিয়ে দুপুরের নির্জনতাকে মুখরিত করে দিয়ে অনাবিল প্রাণের আনন্দে নদী আজ সমুদ্র অভিসারী শক্ত করে আঁকড়ে ধরা সীমান্তের হাতটাকে সম্বল করে।
ঘুম পালানো খাঁ খাঁ নির্জন দুপুরে সীমান্তকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে নদী যখন এসে দাঁড়ালো সমুদ্রের কাছে, অপার বিস্ময়ে নদী দুচোখ মেলে তাকিয়ে রইলো দিগন্ত বিস্তৃত অথৈ জলরাশির দিকে। বিশাল সব ঢেউ প্রচন্ড আক্রোশে বুক ফাটা আর্তনাদে ছুটে এসে সমুদ্রতটে আছড়ে পড়ছে, এ-যে একেবারেই অভাবনীয়। কিসের একটা সম্মোহন শক্তি মনটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়ে নদীকে যেন মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে। নদীর যে হাত আঁকড়ে ধরে ছিল সীমান্তের হাতটি- তার বাঁধন কখন যে আলগা হয়ে গেছে তা একটুও টের পায়নি নদী। নিজেকে খুঁজে পাওয়াটাই যেন অসম্ভব এই মুহূর্তে নদীর কাছে। কানের কাছে বাতাসের শীষ কেটে যাওয়ার শব্দ আর মাথার উপরে ডানা মেলা এক ঝাঁক সী-গালের প্রতিকূল বাতাসের সাথে যুদ্ধ- নদীকে শুধু মুগ্ধই করেনি অভিভূতও করেছে। নদীর মনটা যেন ক্রমাগত ডুবে চলেছে উর্মিমালার মাঝে। নদী চাইছে প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সমুদ্রের ওপার হতে কেউ ছুটে এসে তার ডুবু ডুবু মনটাকে উদ্ধার করুক সমুদ্রের বিশাল উদারতা নিয়ে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সীমান্ত নদীকে দেখছে আর ভাবছে সমুদ্র না দেখা মানুষ যখন সমুদ্রের কাছে আসে তখন তাকে এই মেয়েটির মতই আত্মহারা হতে হয় প্রকৃতির অপার্থিব আর অভাবনীয় রূপটিকে দু চোখের সম্মুখে অবারিত দেখে। তখন নিজেকে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের কাছে বিলীন করতে হয়না। সর্বহারা মন আপনা থেকেই লীন হয়ে যায়। নদীর জন্য সীমান্তের ভালোবাসার হৃদয়ে কত কথা জমাট বাঁধা আছে একটা অনুকূল সময়ের অপেক্ষায়, আজ বুঝি এসেছে সেই আরাধ্য ক্ষণ, কতদিনের কত অপেক্ষার পরে।

সীমান্ত শুধু জানে আজ তাকে জানতেই হবে নদীর মনের ভেতরের খবর। তবে সীমান্তের মনেও আছে শঙ্কা, আকাশের মেঘের কাছে বৃষ্টি চাইলে সে ঝড় হয়েও নেমে আসতে পারে। তাই সীমান্ত অনিশ্চিত ভাবনায় মনের আশঙ্কায় নদীর সাথে তার আলাপনের নাম দিয়েছে--অর্বাচীন সংলাপ ।

নদীর মনে যে ঘোর লেগেছে সেখান থেকে নদীকে বের করে আনার জন্য সীমান্ত অনেকটা কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালে নদীর,কিছু একটা বলা চাই তাই কিছুটা সংকোচ কিছুটা দ্বিধা মনে নদীকে নাম ধরে ডাকলো, তারপর সখেদে নদীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলো,
-আমি যতই নাম ধরে ডাকি না কেন ? তোমার তো সাড়া দেবার শক্তিটুকুও যে অবশিষ্ট নেই, সে আমি ভাল জানি। আমি জানি নদী জীবনের প্রথম সাগর দর্শন মনটাকে আনমনা করে দিয়ে উন্মনা করে তোলে। তোমার বেলাতেও যে তার *ব্যত্যয়* হবে না সে আমার নিজেকে দিয়েই উপলব্ধি করেছি আমার জীবনের সেই প্রথম দিনের সমুদ্র দেখাতে।

“নদী- আজ এই প্রথম তুমি-
এসেছো সাগরের বালুকাবেলায় ----
তোমার অবাক দৃষ্টির বিস্ময়ের ভাষা-
আমি ঠিকই পড়তে পেরেছি-
সাগর বেলায় আসা কত নারী-পুরুষের চোখে--
আমি দেখেছি বিস্ময়ের ঘোর-
শুধু দেখতে পারিনি নিজের-
বিস্ময় জাগানিয়া বিস্মিত চোখের-
সেই অভাবনীয় রূপটি।
নদী জানো, আমি যেদিন প্রথম এসেছিলাম-
সাগর বেলায়, এই বিশাল জলরাশির কাছে-
সেদিন আমিও তোমার মত নিজেকে-
হারিয়ে ফেলেছিলাম, বিমূঢ় বিস্ময়ে।
নীলজল দিগন্ত ছুঁয়ে মনটা যখন-
ঢেউয়ের উপর চেপে চড়ে বসেছিল-
তখন সে আমাকে নিয়ে কেবলই ছুটেছে বল্গাহারা,
তারে ফেরানোই যেন দায় হয়ে পড়ে।
মনের অনুভূতিগুলোর কোন রঙ থাকে না, নদী-
অনুভূতিগুলো প্রকৃতির সাথে মিশে-
একাকার হয়ে যায় সাগরের ফেনীল ঢেউ হয়ে !
পাগলপারা এই মনটা শুধু চায়-
সেই একান্ত চাওয়ার প্রিয় মানুষটিকে,
হাতে হাত রেখে পাশে বসে থাকুক অনন্ত প্রহর।“

নির্জনতার ভাষা কান পেতে শুনতে শুনতে--
রবি ঠাকুরের মতন বুঝে নেবে মন-
তার মনের আড়ালের গোপন ভাষা-
*অনেক কথা যাও যে বলি-
*কোন কথা না বলি-
*তোমার ভাষা বোঝার আশা-
*দিয়েছি জলাঞ্জলি-

বুঝলে নদী-
সমুদ্রের কথা শুনতে বসলে-
জাগতিক কথার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

হৃদয়টাকে কানায় কানায় পূর্ণ করে নিতে হয়,
কুড়িয়ে পাওয়া মুহূর্ত গুলো দিয়ে।

সীমান্তের বলা কথাগুলো বহু দূর থেকে ভেসে এসে যেন আছড়ে পড়লে নদীর কানে। মনের ঘোর লাগা অবস্থা কেটেও যেন কাটেনি নদীর, মুখ ফিরিয়ে চাইলে সীমান্তের মুখে- তারপর মনের ঘোরলাগা থেকেই বলে উঠলে,

- তুমি কবিতা লেখ নাকি সীমান্ত ?
- মনটাকে যে মুগ্ধ করে দিলে বড্ড ! তুমি তো দেখছি কবিদের মত করে-কবিতার ভাষায় কথা বলছ।
- আমার সন্দেহ হচ্ছে সীমান্ত !! তোমার মুখে সাধারণ কথাগুলো-একেবারে অসাধারণ হয়ে বিধৃত হয়েছে।
- আমি যতখানি না অবাক হয়েছি, তার চাইতে বেশি হয়েছি অভিভূত। আমি কি ডুবেছিলাম না,কি ভেসেছিলাম! দুরন্ত ঢেউ গুলি আমাকে নিয়ে ছুটছিল-দূরে আরও দূরে অথৈ জলের আহ্বানে। একের পর এক বিপরীত স্রোতে-- ফেরাতে পারছিলাম না নিজেকে কোনমতে। কতবার ভেবেছি ফিরব না আর ঘরে-কি দরকার জোর করে ফিরে আসবার-ভেসে যাই খড়কুটার মতন অনন্তকাল ধরে। ভাবনা গুলো যেন আকাশের ভাসমান মেঘ- কেবলই ভেসে যাওয়া আনন্দের আতিশয্যে- মনের অনুভূতিগুলো অক্ষরের ছাপ না রাখা- আমি যেন কোন এক কাল উত্তীর্ণ- জীবন উপন্যাসের অলিখিত পাণ্ডুলিপি- এই অপ্রকাশিত আমি নিজেকে কেবলই-প্রকাশ করেছি সমস্ত প্রকৃতির মাঝে-হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে নির্বাসন দিতে পেরেছি-আমার জীবনের এই ক্ষণজন্মা মুহূর্তে-
- বলতে পারো সীমান্ত প্রকৃতির বিশালতার কাছে-আমার নিজের আত্ম সমর্পণ। মনের অনুভূতি গুলো ভাবনার সাথে মিশে-বর্ণিল হয়ে ব্যাপ্তি ই শুধু পায়, তাই- আমার ভাবনার অন্তেও থেকে যায় ভাবনা!

আচ্ছা সীমান্ত তুমি কি বলতে পারো আমাকে-সমুদ্র পারগামি পাখিরা কেমন করে-উড়ে চলে যায় আবার কেমন করে ঘরে ফেরে ?

নদীর কথায় কি যে অসাধারণ মুগ্ধতা। সীমান্তের কাছে মনে হলো গাছের পাতায় পাতায় শব্দ তুলে হঠাৎ বৃষ্টির মত এক পশলা স্নিগ্ধ আমেজ।--তাই নদীকে বললো,

- নদী, তোমার অনুভূতির তুলনা দেই কি দিয়ে ? তোমার কথা শুনে মনে হলো অসাধারণ নির্মোহ- উপলব্ধি আর কি অপূর্ব তার প্রকাশ ! মন বলছে, তুমি প্রকৃতির কবি আর কবিতা লিখো- নির্জলা প্রকৃতির সম্মোহিত সুরে। যে ভাষা প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব-ঠিক সেই ভাষাটাই যেন তোমার কন্ঠে বাণীবদ্ধ !

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি কেবলই শুনেছি।

সীমান্তের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই- নদী বলে উঠলো,

- সীমান্ত জানো, অসংযত প্রলাপে- মনটা কেবলই কথা কইছে, মনের ভেতরে-অন্তঃসলিলা নদীর মতন কলধ্বনি তুলে। কোন বর্ণ নেই সেই ভাষার, কোন সুর নেই- কোন তাল নেই ছন্দ নেই, কোন রঙ্ নেই-অথচ বর্ণিল- কি বলবো তারে ? কোন রঙে্ তারে আমি রাঙাবো সীমান্ত ?

কথাগুলো আভাসে ভাসে, কিন্তু ডুবে যায়- ঢেউ ভাঙ্গা জলে ঢেউ তুলে তুলে-তাল ছাড়া কোন সুর লহরী তোলে না সীমান্ত-ঝিনুক কুড়ানোর যে বাসনা মনের ভেতরে-সেও তো ঝিনুকের সাথে খোলসের ভিতরে-আবদ্ধ হয়ে কেমন নিশ্চিন্তে অথৈ জলের অতলে- তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

মনের দ্বন্দ্বহীন ছন্দ গুলোই শুধু অমিত্রাক্ষর ! যেখানে এত রূপ এত রঙের সমাহার-সেখানে তো আলাদা কোন রঙ্ থাকে না।

-বুঝলে সীমান্ত, কবিতা হলো সপ্তপদী-নিজের ভাব ভাষা আর আত্মার সৌন্দর্য-কত অবলীলায় অন্যের দখলে চলে যায় !! আর তুমি কি না আমাকে কবি বানিয়ে দিয়ে-কবিতা শুনছো আমার কন্ঠে !! অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ সীমান্ত-প্রকৃতির ভাষাটাই অনবদ্য কবিতা। সীমান্ত তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই-অবারিত প্রকৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে দিলে-গোটা হৃদয়টাই কাব্যময় হয়ে ওঠে! সুতরাং কবি না হয়ে তো উপায় নেই কোন-আমার কথাগুলো থেকে যাক না অন্য কারোর অনধিকার চর্চায় অনবদ্য হয়ে।

সীমান্ত মোটেই অবাক হয়নি নদীর বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের অনর্গল অনুরাগ শুনে-
কারণ প্রকৃতির রূপ লাবণ্য চোখের আলোয় উদ্ভাসিত হয়, নানা রঙে্ নানা বর্ণে হৃদয়ের ক্যানভাসে, আর সেখান থেকে যখন আলোর প্রতিফলন হয় তখনই ঘটে বর্ণালীর সমাহার। হৃদয়ের সেই ভাষা একটা আলাদা সৌন্দর্যের মাত্রা নিয়ে ছুটে এসে আমাদের কানে মধুবর্ষন করে। তখন সাধারণ কথাগুলো অসাধারণ অভিব্যক্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়। হৃদয় কথা কয় অনবদ্য কাব্যের ভাষায়।
সীমান্তের মনের আবহাওয়াতে হঠাৎ করে এসে লাগলে পরিবর্তনের হাওয়া। সীমান্তের মন যেন জেনে গেছে অনেক অজানাকে ক্ষনিকের এই আলাপনের মাঝে। একটা প্রশান্তির ভাব মনের ভেতরে ভরে নদীকে বললে,
- নদী, চেয়ে দেখো দুরন্ত ঢেউগুলি পাথরের এই রীফটাতে কি প্রবল বেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে তারপর প্রচন্ড শব্দে ফেটে যাচ্ছে, আর জলকণাগুলো বাতাসে ভাসছে কুয়াশার চাদর হয়ে।
নদী বললো,
- তাইতো সীমান্ত ! কি অভাবনীয় দৃশ্য !
চল না সীমান্ত, রীফের কাছে পাথরের চাতালের উপরে যেয়ে বসি দুজনে।
কথাটি বলে নদী তার দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে দিলো সীমান্তের দিকে। সীমান্ত নির্দ্বিধায় নদীর বাড়িয়ে দেয়া হাতটি ধরে ধীরে হেঁটে এসে বসলো দুজনে সেই চাতাল এর উপর খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে পাশাপাশি।
ঢেউগুলো প্রচন্ড শব্দে এসে আছড়ে পড়ছে রীফে। ঢেউ ফাটা জলরাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়ার মতন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বাতাসে ভেসে এসে লাগছে ওদের চোখে মুখে শীতল অনুভূতির পরশ বুলিয়ে দিয়ে। দুজনের হাতে হাত বাঁধা পড়ে আছে, মুখের কথা ফুরিয়ে গেছে, সন্ধ্যার আবছা আলোয় নির্জন সমুদ্রতটে দুটি প্রাণ যেন প্রাণবন্ত জীবনের আপেক্ষিকতায়। নদীর মনে অবশিষ্ট নেই কোন সমুদ্র বিলাস আর সীমান্তের মনে নেই কোন অর্বাচীন সংলাপ।

শহীদুল হক বাদল
খেলাঘর

(১)
সে আমার এক ঘণিষ্ট বন্ধু- তমাল। বিনা নোটিশেই হঠাৎ একদিন সরকারী ভাল বেতনের এমন চাকুরিটা ছেড়ে দিয়েই কিছুদিন বৈরাগ্যের বেশে ঘোরাঘুরির পর আবার বেসরকারী একটা কোম্পানীতে সামান্য বেতনে কেরাণী পদে একটা চাকুরীতে যোগদান করলো। ওখান থেকেই মূলত তার ভিন্ন জীবনের গল্পটার শুরু। ইংরেজীতে এম.এ পাস করার পরও, আনুষঙ্গিক নানাবিধ কর্ম অভিজ্ঞতার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন যে নামমাত্র এমন বেতনে সে চাকুরিটা করছে, তা আমার কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য ঠেকছে বৈকী। তবে, তার মজ্জাগত স্বভাবটাও যেহেতু আমি জানি, সেজন্যই, এতোটা বিস্মিতও হইনি তখন।

(২)
তার অফিসেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পিএস আব্দুর রহমান সাহেবের গায়ে ছিলো সেদিন বেশ জ্বর। অথচ, জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিঠিপত্র আজই তাকে কম্পোজ করে ভারপ্রাপ্ত ঐ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস ফারিয়ার কাছে নিয়ে যেতে হবে। মিস ফারিয়া এই কোম্পানীর মালিক তথা এমডি ফয়সাল আহমেদের একমাত্র কন্যা সে। তিনি সাময়িক বেশ অসুস্থ থাকায় অফিসের সার্বিক কার্যক্রম তার বাবার পরামর্শেই ফারিয়া এখন দেখাশোনা করছেন। যদিওবা, তার চেহারায় বিদেশী মেম সাহেবার আদলের একটা ছাপও আছে। তবে, তার মেজাজে কিন্তু সেইরকম কোমলতার বিন্দুমাত্র লেশচিহ্নও নেই। লাঞ্চের পরপরই রহমান সাহেব চিঠির ফাইলপত্র নিয়ে মিস ফারিয়ার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তা টেবিলের ওপর রেখে কিছুটা ভয় ভয়েই বিষন্নমুখেও টেবিলের এককোণে দাঁড়িয়ে ম্যাডামের পরবর্তী নির্দেশনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। টেলিফোনে কথোপকথন শেষ করেই মিস ফারিয়া কিছুক্ষণ ধরে ফাইলের চিঠিপত্রগুলো মনোযোগ সহকারে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

(৩)
তারপর রহমান সাহেবকে জিগ্যেস করলেন,
- এ চিঠি দু'টো কি আপনি নিজেই কারেকশন করে তারপর কম্পোজ করেছেন ?
ভীত কণ্ঠে তিনি তার শারীরিক অসুস্থতার বিষয়টি ম্যাডামকে অবহিত করার পর বললেন,
- না ম্যাডাম, তা আমি করিনি। তমালকে এগুলো কারেকশন বা কম্পোজ করতে দিতেও চাইনি আমি। তমাল নিজেই আমার অসুস্থতা দেখে কিছুটা সাহায্য করার জন্য তা করেছে। তবে, এই ছেলেটা কাজে খুবই ভাল। না, বুঝে শুনে কোথাও কি বড় কোনো মিসটেইক করে ফেলেছে ম্যাডাম ?
এই পর্যন্ত বলেই রহমান সাহেবও বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পুনরায় বললেন,
- চিঠিগুলো আমাকে দিন ম্যাডাম। এক্ষুণি আবার সংশোধন করে নিয়ে আসছি।
ফারিয়াও বেশ গম্ভীর করেই কী যেন ভাবলো ? তারপর বেশ কৌতূহল দৃষ্টিতে রহমান সাহেবকে জিগ্যেস করলেন,
- ঐ যে, ক'মাস আগেই তো নতুন জয়েন করলো কেরানী পদে যে, সেই লোকটিও তো ? তার কথাই তো আপনিও সেদিন বলছিলেনও আমাকে বোধহয়।
- জ্বী ম্যাডাম...!

রহমান সাহেবের উত্তর শুনে ফারিয়াও জিজ্ঞাসু কণ্ঠেই তার ভ্র কুচঁকে পুনরায় সে ফাইলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো,
- আচ্ছা, তার লেখাপড়া কদ্দুর, সে ব্যাপারে কিছু কি আপনিও জানেন ?
রহমান সাহেবও এবার নিজের ভয় বা জড়তা কাটিয়ে বেশ গর্ব করেই তার সহকর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিরাট এক ফিরিস্তি পেশ শুরু করলেন। সবকিছু শুনে ফারিয়াও বিস্ময় নয়নে তাকিয়ে বললো,
- সেকি বলছেন আপনি ? ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেছে সে ? আশ্চর্য ! এতো নিম্নপদে কি জন্যইবা চাকুরিটা করছে সে ?

(৪)
তখন ম্যাডামের উৎসুক নয়নে চোখ রেখেই রহমান সাহেবও তমালের পুরো বিষয়টি স্ববিস্তারেই ব্যাখ্যা করলেন এভাবেই,
- ম্যাডাম ! ওর তিনকূলে একমাত্র ছোটবোন ছাড়া আর কেউই নেই তা আমিও জানি। বোনটিরও বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় দু'বছর আগেই। একটা ভাল চাকরিও খুঁজে নিতে বলেছিলাম ওকে আমি। তার জবাবে সেই মাথা পাগলাটা কি বলে জানেন ? সে আমাকে বললো- শুনেন রহমান ভাই! এই একটা পেটের জন্য ৪ থেকে ৫ হাজার টাকাই আমার যথেষ্ট, কি কন ? এই টাকা দিয়েই মেসের থাকা-খাওয়া আমারও বেশ ভালই চলে যায়। কী দরকার ভাই, এতো বেশী কিছু ভেবে ভেবে নিজের মাথাটাও নষ্ট করার- বলেন তো ভাই। তাছাড়া, এইসব চাকরি-বাকরিও আমার ভালা না লাগলে একসময় দেইখেন যে, আমি মাইনষের বাসা-বাড়িতেও বাগান-টাগান দেখাশোনার কাম-কাজও কিছু একটা নিতেও পারি। কখন যে কি করি না করি ? আমার কোনোটারই ঠিক-ঠিকানা নাই।
একথা শুনে ফারিয়ার মনেও কৌতূহলের উৎসুকতাও বেড়ে গেলো। কিন্তু, অধঃস্তন কোনো কর্মচারীর সামনে সে তা প্রকাশ করলো না। অধিকন্তু, সে আবার কর্তৃত্ব ফলাতে গিয়েও ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ টেনে এনেই বললো,
- শুনেছি, ঐ তমাল বাবু নাকি প্রায়ই বিলম্ব করেই অফিসে আসেন ? এটা একটা চাকুরি বুঝলেন ? কারো ইচ্ছেমতো যা তা করবে, তা কিছুতেই চলবে না বলে দিচ্ছি ? আবার এমনতর দেরী করে অফিসে আসলে তার চাকুরিটাও কিন্তু থাকবে না, ওটা তাকে ভালভাবেই বলে দিবেন।

৫)
রহমান সাহেবও সম্মতিসুচক মাথা নেড়ে ও সালাম জানিয়ে ম্যাডামের কক্ষ ত্যাগ করে এসে নিজের চেয়ারে নিসচুপ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। পরদিন দুর্ভাগ্যক্রমেই ট্রাফিক জ্যামে পড়ে অফিস সময়েরও প্রায় দেড়ঘণ্টা পর তমাল অফিসে এলো। রহমান সাহেবকেও তখন বেশ চিন্তাযুক্ত দেখে তমাল বললো,
- আরে চাচা-মিয়া, ভয়ের কিছুই নাই।
একথা বলেই সে তার বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা পদত্যাগপত্রও রহমান সাহেবের সামনে টেবিলের উপর রেখেই হাসিমুখে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছাড়তে ছাড়তে সে কর্মস্থল ত্যাগ করেই কোথায় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বিহ্বলতার ঘোর কেটে যেতেই, রহমান সাহেবও অফিসের মেইন গেটের বাইরে এসে এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ তমালকে খুঁজলো । এমনটাও ভাবছেন তিনি- সবসময় কি আর আকাশে উড়া ঐ বনের পাখিকে খাঁচার বন্দি শেকলে রাখা যায় ? কারো কোনো মায়ার পিছুটান সে রাখবেইবা কেন ? নিজের ছেলের সমবয়সী না হলেও, অজান্তেই তমালকে রহমান সাহেবও তার মনের কোঠায় স্থান দিয়েছিলেন অতি আপন ভেবেই।

কিছুক্ষণ পরই মিস ফারিয়ার রুমে রহমান সাহেবের ডাক পড়লো। বেশ দাম্ভিক ভঙ্গিমা নিয়েই ফারিয়াও রহমান সাহেবকে জিগ্যেস করলেন,
- আপনার তমাল বাবু যে আজকেও অফিসে লেইট। এখনোতো সে অফিসে আসেনি, তাই না ? সে এলেই কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। ওকে চাকুরি থেকে আজই আমি ডিসমিশ করার ব্যবস্থা করবো। ঠিক আছে, আপনি এখন যান।

(৬)

এই কথাটি মিস ফারিয়ার অন্তরের যে ভাষা নয়। যা কেবল তার বাহ্যিক অহমিকার গাম্ভীর্যেই একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ওটা অবশ্য রহমান সাহেবের বোধগম্যতায় আসে নাই তখন। সেই কারনেই বোধহয় তিনিও তমালের পদত্যাগ পত্রটি ম্যাডমের সামনে মেলে ধরে বললেন,
- ম্যাডাম...! তাকে আর অব্যাহতি দিতেও হবে না আপনার। সে নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে এই চাকরি থেকে ইস্তেফা দিয়ে চলেও গেছে আজ সকালেই।
একথা শুনে ফারিয়াও তার বিস্ময় ও মনের ভাবটা আর লুকোতে না পেরেই, রাগে সে নিজেও তার আসন থেকে দাঁড়িয়ে ঐ পদত্যাগ পত্রটি হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। আবার ওটাকেই ঐ টেবিলের উপরেই স্বজোরে ছুঁড়ে মারেও সে। ম্যাডামের এমনতর বিক্ষুব্ধভাব দেখেই রহমান সাহেবও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। সংযমের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় মিস ফারিয়াও বেশ উচ্চস্বরে এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করেই বললেন,
- হ্যাঁ... কী স্পর্ধাইনা তার দেখেছেন ! কেরানীর চাকুরি করবে, তাও আবার রাজা-বাহাদুরের ন্যায়, কী এমন দেমাগ, সে কী ভাবে নিজেকে ? আমিও এর শেষটা দেখে নেবো বলে রাখলাম- বুঝলেন ?
রাগ বা অভিমানের একটা অহঙ্কার চূর্ণের কারণেই বোধহয়, ফারিয়াও বেশ ক'দিন অফিসে আসেনি। সেদিন থেকেই নাকি সে জ্বরেও ভুগছে বেশ। স্নায়ুবিক একটা অন্তরদ্বন্দ্বই যেন তার আজন্ম লালিত চৈতন্যবোধকেও আজ দলিত করেই ধুলোয় মিশিয়ে দিতেও চাচ্ছে এখন। ক'দিন পর অসুস্থতা থেকে ফারিয়া পুরোপুরিভাবে আরোগ্যলাভ না করলেও, পরাজয়ের একটা গ্লানিও তার মনকে ভেতর থেকেই কুঁড়ে কুঁড়েই খাচ্ছিলো। এই অন্ত:দহনের বেষ্টনী ভেদ করে মুক্তির সম্ভাবনাও হয়তোবা খুঁজে পাচ্ছেওনা কিছুতেই। অতঃপর পরদিন অফিসে ফোন করেই সে তমালের ঠিকানাটি জেনে নিয়েই সহসা একদিন তার মেসেই পদার্পণ করলো সে। এমন দ্বৈত চরিত্রের ভালবাসার স্বরূপটাও সচরাচর বোধহয় ভিন্নরকমই হয়ে থাকে।

(৭)

সেদিন, তমাল সবেমাত্র চাপকল থেকে গোসল সেরেই আধভেজা শরীরে গামছায় মাথার চুল মুছতে-মুছতেই গুন গুন সুর তুলে ঘরের চৌকাঠ অবধি পৌঁছেই মিস ফারিয়াকে সে দেখামাত্রই হতচকিত হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। বিব্রত বা অস্বস্তির খোয়াবটি তখনো কাটেনি তার। ফারিয়াও তমালের সেই অনাবৃত সুঠাম দেহের লোমশ বক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই সেও যেন অচেনা একটা আবেশে শিউরে উঠলো হঠাৎ। যদিও, এর পূর্বেও অফিসে তমালের প্রতি বহুবারই ফারিয়ার আঁচচোখা দৃষ্টি সংবরণের কোনো বাধাই মানেনিও তার কোনোদিন। তথাপি, একটা মার্জিত বা শালীনতা বোধজ্ঞান কিছুটা হলেও তখনো অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু আজ পৌরুষ দীপ্ত অথচ চরম উদাসীন এই যুবকের ভ্রূক্ষেপহীন স্পর্ধা তার সেই ঠুনকো আভিজাত্যকেই যেন শেকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে উপহাস করতেও চাইছে। তমালের সারল্যবোধের প্রতিও ফারিয়ার ভালবাসার একটা অনুভূতি প্রগাঢ়তায় যেন মোহাচ্ছন্নতায় ভর করছে তার মনে। তবুও, শুকনো নারিকেলের ছোবলার মতোই মনের বহিরাবরণের শক্তপ্রাচীর ভেঙ্গে অন্তরের সেই কোমলতাকে প্রকাশ হতেও দেয়নি সে তেমনটা আজও এমন।

ততক্ষণে তমালও গায়ে একটা ফতুয়া জড়িয়ে ফারিয়ার মুখোমুখি এসেই পাশের চেয়ারটিতে বসে কুশলাদি বিনিময়ের সৌজন্যতা প্রদর্শনেও কোনো ত্রুটি রাখেনি সে। তখনো সেই গাম্ভীর্যতা বজায় রেখেই ফারিয়া তমালকে কৈফিয়ৎ তলবের ন্যায় জিগ্যেস করলেন,
-চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে এলেন কেন ? সবাই কি আপনার এই পাগলামী সমান চোখে দেখবে ভাবছেন? কাল অবশ্যই সময়মতো অফিসে আসবেন। ও হ্যাঁ, সঙ্গে সব সার্টিফিকেটসহ আনুষঙ্গিক কাগজ-পত্রাদিও আনতে ভুল হয় না যেন-ঠিক আছে ?
কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর তমাল মিস ফারিয়াকে বিনীতভাবেই বললো,
- তোমাকে ধন্যবাদ ফারিয়া। আমিও ভাবছিলাম, চাকুরি-বাকুরি এইসব আর করবোও না আমি।
হঠাৎ তমালের মুখ থেকে তার নাম ধরে এমন ডাক শুনেই সেও মনে মনে খুশি হলেও, ভাললাগার ভাবটি চেপে রেখেই কেবল ম্লান হেসে ফারিয়া বললেন,
- তাহলে, এই যে মহারাজ...! আপনি কি করবেন শুনি ? ঘরে বসে থাকলে কি সরকার আপনাকে বেকারভাতা দেবেন ? নাকি ঘরজামাইয়ের ফন্দি আঁটছেন কোথাও ?
একথায় দু'জনই একসঙ্গে হেসে উঠলো। এমনসময় মেসবয়টা এসে ফারিয়াকে চা-বিস্কুট দিয়ে পেছন ফিরে ফিরে সেও মুচকি হেসে চলে গেল।

(৮)
তারপর তমাল তার স্বভাবসুলভ কৌতুকস্বরেই বললো,
- ভাবছি, কিছুদিন পীর-ফকিরের মাজারে মাজারেও ঘুরবো আমি। ঐসব পীর-বাবার গরু-ছাগলের দেখাশোনার কাজও নিতে পারি। জানেন, সেখানকার খাবার-দাবারও বেশ ভালোই শুনেছি। কেউ চাইলে বিয়ে-শাদীরও ব্যবস্থা তিনি করে দেন। কি দরকার, খামাকা প্রতিদিন মহিলা বসের এমন ধমক-ধামক শোনার ?
একথা শুনে ফারিয়ার হাসির বাঁধও যেন সহসাই ভেঙে গেলো। এভাবে কোনোদিনই সে নিজকে মন খুলে হাসতেও দেখেনি হয়তোবা। তারপর, হাসি থামিয়েই আবার বললো,
- সরি...! আর কোনো ধমক শুনতেও হবে না- ঠিক আছে তো? কাল অফিসে না এলে কিন্তু অফিসের অর্থ আত্মসাদের মামলাও ঠুঁকে দেবো আপনার নামে। তখন হাঁড়ে-হাঁড়েই টের পাবেন- বুঝলেন ?
ফারিয়ার এমন কথার জবাবে হাসিমুখেই তমাল বললো,
- মিথ্যা মামলায় একসময় কিছুদিন জেলও খেটেছি আমি। কিছুটা নির্যাতনের মধ্যে মাঝে মাঝে থাকলেও ভালোই হয়, কি বলেন ? তাতে একটা কবি-কবি ভাবও চলে আসে মনে।
তখন মিস ফারিয়াও অভিমান করে কিছুটা রাগের ভাব করায়, তমালও সেইসময় নিজের মাথা চুলকানোর এক মৌনতায় তার দৃষ্টিও অন্যত্র ফিরিয়ে মিটমিট করে সেও হাসলো। ফারিয়াও তাতে যোগ দিলোও বটে। তার দু'চোখের কোণে আনন্দাশ্রুও যেন টপটপ ফোটায় উপচে পড়বে এমনই। এই সুখানুভূতির মুহুর্তটিও শুধুই যে তার একার। এর কোনো ভাগ সেও আজ কাউকেই শেয়ার করতেও নারাজ।
এই গল্পের শেষ কাহিনীর রেশটুকুই কেবল আমি জানি। ওদের দু'জনের সামাজিকভাবে আর্থিক বৈষম্য ও ব্যবধান কিংবা জন্মগতও লালিত দৃষ্টিভঙ্গির এতোটাই যে ব্যবধান। তাই, ফারিয়ার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তমালের বৈরাগ্য মনও কিছুতেই সায় দিতেও চাইছিলো না কিছুতেই। যদিও ফারিয়ার বাবার পাঠানো বিয়ের প্রস্তাব বা ফারিয়াও যে নিজেকে তমালের নিকট সমর্পণের আবেগঘন কাতরতার আহ্বান-ওতেও বিনম্রভাবেই তমাল অসম্মতিও জানায়।

(৯)
অতঃপর, বিশেষ করে তমাল তারই একমাত্র ছোটবোনের অনুরোধ বা আবদার উপেক্ষা করতে না পেরেই শেষ পর্যন্ত সেও বিয়েতে সম্মতি জানায়।
শুনেছি- রাজধানীর আভিজাত্য আর আড়ম্বর জীবন ছেড়ে ওরা মোহনগঞ্জ নামক এক মফস্বল শহরে ঐ কংশ নদীর পাড় ঘেঁষে গড়েও তুলেছে দু'জনের সুখের সেই শান্তিনিবাস। একই স্কুলে ওরা দু'জনই শিক্ষকতাও করছে জেনেছি। স্কুল ছুটির পর, প্রায়ই ওরা একসঙ্গেই নীড়ের অভিমুখে শুরু করেও ঘরে ফেরার যাত্রাপালা। একই গন্তব্য পথে যেতে যেতেই ওরা কিছুটা ফাঁকা একটু নিরিবিলি পেলেই হাত ধরেই দু'জনার চলেও পথ চলা। তমালও ফিসফিস করে কী যেন বলতেই- ফারিয়াও হাসতে হাসতে তমালের গায়ে যেন লতার ডগার মতোই লুটিয়ে পড়ে । এত শত হিসেবী জীবন দিয়ে কি আর নির্মল সুখানুভূতির স্বপ্ননীড় গড়ে ওঠে কখনো কারো ? মনের গহীনে মানুষের যে সুপ্ত সত্ত্বার তপস্যা... তাকে কতোটুকুইবা আমরা জানি, কিংবা চিনি...???

প্রবন্ধ

অধ্যাপক ড. জহুরুল আলম

ভাষা আন্দোলন: স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে যেমনভাবে ১৯৭১ সালের নয় মাসের কাঠামোর ভেতরে আবদ্ধ করা যায় না ঠিক সেভাবেই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস কেবল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলী, এমনকি কেবল পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী বিদ্বেষ, বিভেদ ও অনাচারের ইতিবৃত্ত নয়। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম বাঙালি জাতির বহু যুগের সংগ্রামের এবং সেই সঙ্গে ভাষার উত্তরণ ও জাতির গর্বের ইতিহাস যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করে যাবে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শুরু ১৯৫২ সালেরও অনেক আগে থেকেই। বস্তুত:পক্ষে মুসলীম লীগের রাজনীতি কখনোই বাঙালিদের ভাষাকে কোন প্রকার মর্যাদা দেওয়ার সপক্ষে ছিলো না। জিন্নাহ ও অন্যান্য মুসলীম লীগের উর্দূ ভাষাভাষী নেতারা দেশ বিভাগের বহু পূর্বেই ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের ‘Lingua Franca’ হিসেবে উর্দূকে নির্বাচন করে রাখেন। এ উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত মুসলীম লীগ ১৯৩৬ সালের জুন মাসে ১৪ দফা ইশতেহার প্রকাশ করে। মুসলীম লীগ মত প্রকাশ করে যে বাংলার মুসলমানদের দাপ্তরিক ভাষা বাংলার বদলে উর্দূ হওয়া উচিত।

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। পাকিস্তানী শাসকদের ক্ষমতার অপব্যবহার, গণতন্ত্রহীনতা, সুশাসনের অভাব ও সর্বোপরি পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে পূর্ব বাংলার প্রতি ধারাবাহিক বিমাতাসুলভ আচরণ, যা মুসলিম লীগের এবং পাকিস্তানের নীতির মূল উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তা এ দেশের মানুষের চেতনাকে তথাকথিত ‘মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের’ মিথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

পাকিস্তান আন্দোলনে এ দেশের আপামর জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের গঠনমূলক ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পর পরই এ দেশের ছাত্র, জনতা ও রাজনীতিবিদরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন যে তাদের এই সমর্থন ছিল একটি ঐতিহাসিক ভুল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালীর ওপর প্রথম আঘাতটি আসে তার মাতৃভাষার অধিকার হরণের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এ ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালেই রচিত হয় ‘রাষ্ট্রভাষা ইশতেহার’ যা ‘রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার’ নামে পরিচিতি পায়। এই প্রথম দলিলটি প্রণয়ন করে এর সমর্থনে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হতে থাকে। বাংলার মানুষের ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছাত্র সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালে শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও ঐকান্তিক পরিশ্রমে গঠিত হয় ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে দশটি দাবি উত্থাপন করা হয় তার মধ্যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটি ছিল অন্যতম।

এ সময় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা একটি সময়ের দাবি হিসেবে সামনে চলে আসে। ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ফজলুল হক হলে একটি যৌথ সভা আয়েজিত হয় ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। শেখ মুজিবের প্রস্তাবানুযায়ী

এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের। যেহেতু ছাত্র সমাজই এই আন্দোলনের পুরোধা ও মূল চালিকাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় সেহেতু ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রাবাসের কমিটি থেকে ন্যূনতম দু'জন করে প্রতিনিধি রাখার ব্যাবস্থা করা হয়। এই ঐক্য প্রক্রিয়া ছিল একটি সুদূরপ্রসারী সংগ্রামের পরিকল্পিত সূচনা। এরপর থেকে ভাষা আন্দোলন ক্রমশই বেগবান হতে থাকে। নবগঠিত ও নবশক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ দাবি আদায়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে হরতাল আহ্বান করে। হরতাল যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয় ও সারা বাংলায় ব্যাপক গণসমর্থন লাভে সমর্থ হয়।

এ দিন শেখ মুজিব জঘন্য পুলিশী নির্যাতনের শিকার হন এবং এক পর্যায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ১৩ মার্চ ঢাকায় পুনরায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় ও ১৪ মার্চ সারা বাংলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক ৮ দফা চুক্তির অন্যতম দুটি দফা ছিল, রাজবন্দীদের মুক্তি ও বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের সর্বপ্রথম বিজয়, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বাধ্য হয়েছিল জনতার শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে। পরবর্তী ইতিহাস অবশ্য পাকিস্তানী শাসকগণকর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের ইতিহাস যার মূল নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন মি. জিন্নাহ ও খাজা নাজিমুদ্দীন।

চুক্তির শর্তানুযায়ী শেখ মুজিবসহ অন্যান্য বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এরপর থেকে শেখ মুজিবকে বিশেষ নজরে রাখতে শুরু করে ও শেখ মুজিবের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত মনিটরিং করতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকান্ডের আগেই তাই শেখ মুজিবকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল পুনর্বার। এক পর্যায়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের অজুহাতে ছাত্রত্বও বাতিল করে দেয়া হয়, যাতে করে তার পক্ষে ছাত্র রাজনীতিতে বিশেষত ভাষা আন্দোলনে তার নেতৃত্ব প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তি অনুযায়ী মুক্তি পাওয়ার পরদিনই, অর্থাৎ ১৬ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব। তার নেতৃত্বে একটি জঙ্গী মিছিল গণপরিষদ অভিমুখে রওনা হয় ও পথিমধ্যে পুলিশী বাধার সম্মুখীন হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন ১৭ মার্চ আবার বটতলায় ছাত্রলীগের সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মুজিব, তাজউদ্দীন, তোয়াহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকে শেখ মুজিবকে ধারাবাহিকভাবে বহুবার কারান্তরালে পাঠানো হতে থাকে। কিন্তু কারান্তরালে থেকেও মুজিবের চিরকুটে পাঠানো নির্দেশাবলী বাইরের সংগ্রামী ছাত্র-জনতার সংগ্রামের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে যেতে থাকে। পাকিস্তানী শাসকদল অগত্যা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির ১৬ তারিখের পর কোন এক সময় মুজিবকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করে, যাতে করে তার পক্ষে জেলের অভ্যন্তরে থেকেও চিরকুট বা অন্য যে কোন পন্থায় আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের সম্ভাব্য এ্যাকশনের ব্যাপারে মুজিব ও তাঁর সাথীরা পূর্বাহ্নেই জানতেন। ফলত, মুজিব যথারীতি ফরিদপুর যাওয়ার আগে ও পরে সেখান থেকেই বিস্তারিত নির্দেশনাবলী সংবলিত চিরকুট ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে ধারাবাহিকভাবে পাঠাতে থাকেন যা রাষ্ট্রভাষার সংগ্রামকে বেগবান করে ও সাফল্যের দোরগোড়ায় নিয়ে যায়।

১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমা প্রতিনিধি সম্মেলনে মুজিব আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন। ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবিটিও উত্থাপন করেন সর্বপ্রথম শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের জনসভায় বক্তব্য প্রদানকালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস তিনি হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়ার দাবি জানান এবং পুনরায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার জোর দাবি জানান।

অমর একুশের পথ ধরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলার জনতা তাদের সকল আশার প্রতিভূ যুক্তফ্রন্টকে প্রাদেশিক পরিষদে এনে দেয় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন পায়, যা মোট আসনের শতকরা ৯৪ ভাগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বাংলার মানুষকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায়। এই ষড়যন্ত্রের পথ ধরেই আসে অইয়ুব-মোনেম-ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্র। সমান্তরালভাবে বেগবান হতে থাকে বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের মাধ্যমেই শেখ মুজিব রূপান্তরিত হন বাংলার মানুষের প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধুতে। তাঁর নেতৃত্বে অনেক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়ে, লাখো মা-বোনের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পাই স্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালে স্বাভাবিক কারণেই আমাদের আন্দোলনগুলোতে স্বাধীনতা, স্বাধিকার বা স্বায়ত্তশাসনের কোন এজেন্ডা ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের চাতুরি, বিশ্বাসঘাতকতা ও লুণ্ঠনের বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীরা তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে বসবাস করার জন্য। অপরদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক জোট একত্রে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল 'ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের' মুখোশের আড়ালে পূর্ব বাংলাকে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে।

তাদের এই পরিকল্পনার প্রকট বহির্প্রকাশ ঘটে তখনই যখন ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। জিন্নাহ বা তার অনুসারীরা কখনই এ ধরনের অবিবেচক এবং একতরফা সিদ্ধান্তের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে সক্ষম হননি বা সে প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। তৎকালীন পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার মধ্যে চার কোটি বিশ লাখ বা তারচেয়েও বেশি মানুষের, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। অবশিষ্ট তিন কোটি তিরিশ লাখের বসবাস ছিল অন্য সব প্রদেশ মিলিয়ে। পাকিস্তানে তখন পূর্ববাংলা ছাড়াও আরও চারটি প্রদেশ ছিল। তারচেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উর্দু ভাষা পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের মানুষেরই মাতৃভাষা ছিল না। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশেরও কম মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলত এবং তারা মূলত ছিল ভারত বিভাগের আগে ও পরে ভারত থেকে পাকিস্তানে আগমনকারী বাস্তুহারা মানুষ যাদের মুহাজির বলা হতো।

পৃথিবীর সব মানুষের মাতৃভাষাই সম্মানের। তার পরও বিবিধ কারণে কিছু ভাষার উৎকর্ষ অন্য ভাষার চেয়ে অধিক হয়ে থাকে। বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এ কারণেই যে, রাষ্ট্রভাষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মি. জিন্নাহর বাংলা ভাষাকে যে কোন মাপকাঠিতেই বাতিল করে দেয়ার বিষয়টি ছিল অপরিপক্ক ও অর্বাচীন আচরণ। এ ভাষার ঐতিহাসিক উত্তরণের পটভূমি, এর বিশালত্ব, বিশ্ব স্বীকৃতি, কোনটিই ১৯৪৭ সালে একে পাকিস্তান বা এ উপমহাদেশের বা বিশ্বের অন্য কোন ভাষার সমকক্ষ না ভাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। সেটি ছিল বাংলা ভাষার রেনেসাঁর যুগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সময়টি ছিল নজরুল, বঙ্কিম, শরৎ, জীবনানন্দ, সুকান্ত, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর এবং এদের মতো আরও অনেক বিশাল ব্যক্তিত্বের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে

পদচারণার সময়। এই প্রেক্ষাপটে এ ভাষাকে অবহেলা করা ছিল নিজের অজ্ঞতা ও দীনতার বহির্প্রকাশ। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ কাজটি করে নিজের দীনতাকেই প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন ১৯৪৮ সালে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে মানুষের অধিকার হরণ, শোষণ, বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র ও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের ইতিহাস। দেশটির আবির্ভাবের প্রথম দশকেই কমপক্ষে সাতজন প্রধানমন্ত্রী, চারজন গভর্নর জেনারেল এবং একজন প্রেসিডেন্টকে বলপূর্বক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ২৩ বছরের তথাকথিত ঐক্যের ১৩ বছর কেটেছে সরাসরি সামরিক শাসনের যাঁতাকলে। গণতন্ত্রহীনতা ও অধিকার হননের এই ২৩ বছরে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছে বাংলার মানুষ। অথচ বাঙালীরাই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আলোকে দেশ গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেশ বিভাগপূর্ব গণভোটে (Plebiscite) বাংলা ও সিন্ধু ছাড়া আর সব প্রদেশই অবিভক্ত ভারতকে খন্ড বিখন্ড করে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছে। সিন্ধুতেও মুসলিম লীগ জিতেছিল মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হচ্ছে এই যে, পাকিস্তান গঠনে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা রাখা বাংলাই সবচেয়ে আগে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে সে রাষ্ট্র কাঠামো হতে।

নিজের জীবদ্দশায় মি. জিন্নাহর একবারই বাংলায় আসার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের সেই আগমন পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য ও জিন্নাহ সাহেবের নিজের জন্যও ভাল কিছু বয়ে নিয়ে আসে নাই। তার রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ২১ মার্চের বক্তব্য বস্তুতপক্ষে সরাসরি প্রকাশ করে দিল বাংলার প্রতি পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ ও এলিট শ্রেণীর অবজ্ঞা ও অসহিষ্ণুতার বিষয়টি।
জবরদস্তিমূলক সিদ্ধান্তসমূহ এর পর থেকে বার বারই চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতে থাকে পূর্ব বাংলার ওপর, যা এদেশের মানুষকে, রাজনীতিকে ও সমাজকে রাজনৈতিকভাবে আরও সুসংহত হওয়ার পথে নিয়ে যায়। এ দেশের আপামর জনসাধারণ, বিশেষত রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদরা ধীরে ধীরে অনুধাবন করতে থাকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলার অমর্যাদার বিষয়টি।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চের রেসকোর্সের বক্তব্যে জিন্নাহ ঘোষণা করলেন : 'আমি আপনাদের সবাইকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যপারে যে বা যারাই আপনাদের বিভ্রান্ত করবে, সে অবশ্যই পাকিস্তানের শত্রু। '(Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Aûone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan')। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্য কেবলমাত্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভূতিকে অবহেলাই করেনি, বরং এটা প্রকাশ করে দিল তাঁর অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। জিন্নাহ সাহেবের অযৌক্তিক জেদ ও জবরদস্তিমূলক বক্তব্য পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পাঞ্জাব ও সিন্ধুর এলিট শ্রেণীর মনোভাবের বহির্প্রকাশ ছিল, যারা পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মানুষের অধিকার নিয়ে সবসময়ই ছিনিমিনি খেলেছে।

১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত কনভোকেশনে রাষ্ট্রভাষা ইস্যুতে আরও আক্রমণাত্মক ভাষায় তাঁর ইতোপূর্বে প্রদত্ত বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন। মি: জিন্নাহ বাংলা ভাষার সন্মান রক্ষায় আন্দোলনরত ছাত্র, শিক্ষকসহ এ দেশের মানুষকে পাকিস্তানের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অপমানিত করেন। জিন্নাহ ভাষা ইস্যুটিকে ভারতের দালালি বলে অখ্যায়িত করেন। তাঁর ভাষায় : 'Our enemies, among whom I regret to say, there are still some Muslims, have set about actively encouraging provincialism in the hope of weakening Pakistan and thereby facilitating the re-absorption of this province into the Indian Dominion'. এর ভাষান্তর করলে যা দাঁড়ায় তা হলো : 'আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখনও কিছু মুসলমান (নামধারী) শত্রু আমাদের মাঝে আছে যারা প্রাদেশিকতাকে উস্কে দিচ্ছে এবং পাকিস্তানকে দুর্বল করে পুনরায় ভারতের অংশীভূত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' বাঙালীর নিজের ভাষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিকে

জিন্নাহ পাকিস্তানের ঐক্য বিরোধী হিন্দুস্তানী দালাল চক্রের কাজ বলে অভিহিত করলেন! এভাবেই পরবর্তী সময়ে সব সময়ই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকের দল এবং তাদের এদেশীয় বশংবদেরা বাংলার অধিকারের সকল প্রশ্নেই ভিনদেশী বা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে থাকল।

জিন্নাহর ঢাকা সফর তাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে কেবল একটি ব্যর্থ মিশন হিসেবেই নয় বরং এই সফর পূর্ব বাংলার মানুষকে প্রকৃতপক্ষেই অসন্তুষ্টি এবং অবিশ্বাসের এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখান থেকে ফিরে আসা দুরূহ ছিল। তারপরও বাংলার মানুষ আরও অনেক বছর পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে বসবাস করেছে অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের শাসককুলের বোধোদয় কখনও হয়নি। সম্ভবত সেটা হওয়া সম্ভবও ছিল না। আজও পাকিস্তানে জাতিগত বিভেদ এবং হানাহানি পৃথিবীর অনেক দেশ ও জাতির চেয়ে বেশি। তার চেয়েও বেশি খারাপ হচ্ছে তাদের ধর্মের আবরণে নৃসংশতা চালিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি।

জিন্নাহর আক্রমণাত্মক ও আপোসহীনতা এ দেশের জনগণের কাছে তার ও প্রকারান্তরে প্রতিটি পাকিস্তানী শাসকের ভাবমূর্তিকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়। বাংলার রাজনীতিবিদগণ তখন থেকেই সুচিন্তিতভাবে পাকিস্তানীদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে থাকেন। জনগণের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের মিথ তৈরি করা হয়েছিল তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়। আসলে এই সফরটিকে ধরা যায় পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষের এবং পাকিস্তানী শাসকদের সম্পর্কের এসিড টেস্ট হিসেবে। বাংলার মানুষের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা যতই ভ্রাতৃত্বের কথা বলুক না কেন, তারা কখনোই তাদের স্বার্থের পরিপন্থি কিছুই বাংলার মানুষের জন্য কখনও করবে না। বরং নিজস্বার্থ হাসিল করার জন্য প্রয়োজনে এ দেশের মানুষকে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করবে। এদেশের নিরাপত্তা বিধানের কোন পরিকল্পনাও তাদের কখনোই ছিল না। এ বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা গেল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। বাঙালীরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলো যে, পাকিস্তানের কাঠামোয় জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে অনিরাপদ।

জিন্নাহ-প্রদর্শিত পথ ধরে এরপর থেকে সকল পাকিস্তানী শাসকরাই এদেশের জনগণের সকল প্রকার অধিকার আদায়ের অন্দোলনকে সর্বদাই ভারতের ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করে দমন-পীড়ন চালিয়ে যেতে থাকে। একের পর এক ক্ষমতা দখলকারী পাকিস্তানের সামরিক শাসকের দল বাংলার জনগণের প্রাণের দাবিগুলোর সঙ্গে তথাকথিত ভারতের ষড়যন্ত্রের মন্ত্রকে একীভূত করে নিরীহ মানুষের ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে উস্কে দিয়ে তাদের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করতে লাগল। মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ সামরিক ও আধাসামরিক শাসকের দল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে জনগণের মাঝে ভারতবিরোধিতার বীজ বপন করে যেতে থাকল। প্রয়োজনানুযায়ী ছোট বড় সীমান্ত সংঘাত বা যুদ্ধ বাধিয়ে দুই দেশের শাসকরাই নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর থেকেই চালিয়ে যেতে থাকল। পাকিস্তানের অবৈধ ক্ষমতা দখলদারীদের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে চতুর এবং ফলপ্রসূ কৌশল। যখনই মানুষ গণতন্ত্র, সুশাসন বা মানবাধিকারের প্রশ্নে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতো তখনই তারা তাদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ভারতীয় জুজুকে টেনে নিয়ে আসত। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের ধারাবাহিক আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় এই বার্তাই বহন করে যে অত্যাচারী, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী শোষকের দল যত শক্তিশালীই হোক না কেন শেষাবধি জনতার শক্তির কাছে তাদেরকে মাথা নত করতে হয়।

রেসকোর্সের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত অতি আলোচিত ও সমালোচিত বক্তব্য দেয়ার ছয় মাস পর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু হয়। কিন্তু যে রাজনৈতিক দর্শনের তিনি গোড়াপত্তন করেন এবং সযত্নে লালন করে যান তাঁর সকল উত্তরসূরী সেই দর্শনকে আঁকড়ে ধরে পাকিস্তানের ঝান্ডা উড়িয়ে চলতে থাকে।

এ দেশের মানুষের নিজের ভাষার ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধের গভীরতা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যূনতম ধারণা ছিল না। সে ভালবাসা এতটাই গভীর ও নিখাদ যে, এ জন্য মানুষ নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করেছে। মাতৃভাষার জন্য পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে রাজপথে সংগ্রাম করে জীবন দিতে হয়নি। এখানেই বাঙালী জাতির অবস্থান অন্য সকল জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক ওপরে।

একজন দূরদর্শী নেতার গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে মানুষের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত তার মনোভাব বুঝতে পুরোপুরি সক্ষম হওয়া এবং সেভাবেই নিজের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করা। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের কোন নেতাই এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। পূর্ব বাংলায় এসে মি. জিন্নাহ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, যে কোনভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করিয়ে নেয়া যায় কী-না। এ উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৪৮ সালের ঢাকা সফরের আগেই খাজা নাজিমুদ্দীনকে নির্দেশ দেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সেই স্বীকৃতি আদায় করে নেয়ার জন্য। জিন্নাহর প্রত্যাশা ছিল যে, ঢাকার অবাঙালী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুর পক্ষে এ ধরনের একটি চুক্তি করতে সক্ষম হবেন! কিন্তু বাস্তবে সবকিছু ঘটলো সম্পূর্ণ অন্যরকম। খাজা নাজিমুদ্দীন বরং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সকল দাবি মানতে বাধ্য হলো। স্বভাবতই তা ছিল মি. জিন্নাহর জন্য হতাশাব্যাঞ্জক। পরবর্তী সময়ে খাজা নাজিমুদ্দীন জিন্নাহর নির্দেশে পরিষদের সঙ্গে করা চুক্তির সকল শর্ত অস্বীকার করে এবং মি. জিন্নাহর বাংলা সফরের আগেই চুক্তিটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। উপরন্তু নাজিমুদ্দীন প্রস্তাব দেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের নয় শুধু পূর্ব বাংলার দাফতরিক ভাষার স্বীকৃতি দেয়া হবে এই শর্তে যে, এই প্রদেশে ইংরেজীর সকল প্রকার ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে যথারীতি সকল ভাষাই প্রযোজ্য থাকবে।

খাজা নাজিমুদ্দীনের নতুন প্রস্তাব ছিল বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। এ ধরনের চুক্তির বরখেলাপ পাকিস্তানী শাসকেরা বাংলার মানুষের সঙ্গে বার বার করেছে। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া, আইয়ুব খানের শাসনামলের নিষ্পেষণ, বাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার, সত্তরের নির্বাচনের পর আলোচনার নামে বিশ্বাসঘাতকতা ও বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে তাঁকে বন্দী করে পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ করা এবং ২৫ মার্চের পর থেকে নির্বিচারে গণহত্যা চালানো। এমন আরও হাজারো বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে জর্জরিত পাকিস্তানের রাজনীতি। এ ধরনের রাজনীতিই পাকিস্তানে শোষণ ও বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন ব্যতীত পাকিস্তানের রাজনীতির মৌলিক চরিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন বা কোন নীতিগত উত্থান পরিলক্ষিত হয়নি, বিশেষত: রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিষয়ে। ঢাকার অবাঙালী মুসলিম লীগার ও পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতা বলয়ের একান্ত বিশ্বাসভাজন খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্নর জেনারেল হন, আর আরেক তাবেদার নুরুল আমিনকে নিযুক্ত করা হয় পূর্ব বাংলার চীফ মিনিস্টার হিসেবে। ফলত: রাষ্ট্রভাষার বিষয়টির কোন ইতিবাচক সুরাহা ঘটে ওঠার সম্ভাবনা আপাতত বিলুপ্ত হয়। পাকিস্তানী শাসকেরা নীতিগতভাবেই পূর্ববাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিপন্থী উদ্যোগ গ্রহণে মনোনিবেশ করে। অপরদিকে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল নাগাদ রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত দৃশ্যমান কোন বড় সংঘাত বা উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হলেও বাংলার মানুষের মাঝে বিভিন্নভাবেই ভাষাগত ও জাতিগত ঐক্য গঠন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে থাকে ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের বিপরীতে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের

মাধ্যমে। বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনের এই পরিবর্তনই মূলত পরবর্তী সময়ে বাংলার মানুষের বিশাল রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। তরুণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান এই বিশাল পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

যদিও রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয়টি আপাতদৃষ্টে কিছুকালের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়ে পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে, তথাপি বাংলার মানুষ কখনই এই ইস্যুকে বর্জন করেনি। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এর স্বীকৃতির বিষয়টি বাংলার মানুষের মানসপটে ছিল সদা জাগরুক। বরং আপাতদৃষ্টে শান্ত পরিশে ছিল এক মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস। জনতা ধীরে ধীরে একদিকে জাগরিত হচ্ছিল জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে, অপরদিকে একটি রাজনৈতিক মেরুকরণের পথে অগ্রসর হচ্ছিল বাংলার রাজনীতি। মুসলিম লীগের তরুণ নেতৃত্বে যেখানে শেখ মুজিবের উত্থান ঘটছিল ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে, সেই নেতৃত্ব সেক্যুলার মতবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে অগ্রসরমাণ ছিল। ফলত ১৯৪৯ সালেই বাংলার মাটিতে রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের পতন শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন ও তারপর এই দলের অসাম্প্রদায়িক নীতির বিকাশ এবং আওয়ামী লীগ নাম ধারণ বাংলার রাজনীতিকে এ দেশের গণমানুষের রাজনীতিতে পরিণত করে। অনাদিকালের সম্প্রীতির সমাজ নিজের অবস্থান বুঝে নেয় ও ধর্মান্ধ পাকিস্তানী ভাবধারাকে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়, যা পাকিস্তানী শাসকদের করে তোলে আরো হিংস্র ও প্রতিশোধপরায়ণ। পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাসের গতিধারা প্রবাহিত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের নিজের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের রাজনীতিতে।

১৯৪৮ সালের ২৭ নবেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান দশ দিনের সফরে ঢাকা এলে ডাকসুর তরফ থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই সমাদরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বাংলার চলমান দাবিটিকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়া। ছাত্ররা এই উদ্দেশ্যে লিয়াকত আলীতে যে স্মারকলিপি প্রদান করে তার ভাষান্তর ছিল এ রকম : অমরা যদিও উর্দুকে ‘Lingua Franca’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি, তথাপি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, দেশের সর্ববৃহৎ প্রদেশের জনগণের মাতৃভাষা হিসেবে এবং পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে উর্দুর সঙ্গে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হোক। অন্যথায় আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকেরা সর্বদাই প্রতিকুলতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে থাকব। ছাত্রদের এই দাবির প্রতি লিয়াকত আলী খান ছিলেন অনমনীয় ও সম্পূর্ণ অবিচলিত। তাঁর আচরণে এটাই প্রকাশিত হলো যে, বিষয়টি মীমাংসিত এবং এ বিষয়ে কোন আলোচনার অবকাশ নেই। এভাবেই মি. জিন্নাহর উত্তরসূরিরা ধারাবাহিকভাবে ঘটনা পরম্পরায় জিন্নাহ ঘোষিত অর্বাচীন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যাওয়ার পথে চলতে থাকে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক প্রচেষ্টার একটি ছিল আমাদের চিরসুন্দর বাংলা অক্ষর পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। আমাদের অক্ষরের স্থলে আরবী হরফে বাংলা লেখার পাকিস্তানী সিদ্ধান্ত। ‘ইসলামের স্বার্থে বাংলা ভাষার আরবীকরণের’ এই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন বাংলাভাষী শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। আজ অবাক বিস্ময়ে ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা বার বার খুঁজে পাই এই নির্মম সত্য যে, বাংলার মাটিতেই জন্ম হয়েছে কত শত বিশ্বাসঘাতকের। ফজলুর রহমান তার কুখ্যাত ‘বাংলা ভাষার আরবীকরণের’ প্রস্তাবটিকে উপস্থাপন করে ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে। এই উদ্ভট প্রস্তাবের সমর্থক গোষ্ঠীর মতে পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি এবং সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বাংলা অক্ষরের বিলুপ্তির প্রয়োজন এবং এর পরিবর্তে আরবী হরফ প্রবর্তন আবশ্যক।

পাকিস্তানকে টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এভাবেই এই দেশটির জন্মলগ্ন থেকেই এ দেশের শাসকশ্রেণী যত্র তত্র ইসলাম ধর্মের অপব্যবহার করেছে। এই শাসকশ্রেণীর চেতনায় সর্বদাই এটাই বিদ্যমান ছিল এবং আছে যে, তারাই ইসলামের রক্ষক এবং তাদের এই ‘পবিত্র’ কর্ম সমাধা করার জন্য

তারা যখন যেভাবে তাদের প্রয়োজন সেভাবেই মানুষের ওপর অত্যাচারের খড়গ নামিয়ে আনতে পারে। অথচ ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় যে, ইসলামের এসব রক্ষকের সবারই জীবনাচরণ ছিল প্রকৃত ইসলাম থেকে শত যোজন দূরেই শুধু নয়, বরং চরম ইসলামবিরোধী জীবনযাপনে ছিল এরা অভ্যস্ত। মি. জিন্নাহ নিজেই উত্তরাধিকার সূত্রে ছিলেন একজন শিয়া মতাবলম্বী। আর তার জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল পুরোপুরি অনৈসলামিক। পরবর্তী শাসকদের মধ্যে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানসহ আরো অনেকের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল অনেক বেশি অনৈসলামিক। এসব শাসক সর্বদাই নিজেদের বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, গণতন্ত্র, অধিকার ও সুশাসনের বিষয়গুলো বিচার করত। এ জন্যই সে সময়ে এবং এখনও পাকিস্তানের সকল প্রদেশের সব অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করা, সাম্য ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা, সবার জন্য ন্যায়বিচার কায়েম করা পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে একটি অবান্তর ধারণা হিসেবে ছিল এবং রয়ে গেছে এখনও।

১৯৪৯ সালের পেশোয়ার কনফারেন্সের পর পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পাকিস্তানের সব ভাষায় কেবল আরবী হরফ ব্যবহারের সুপারিশ করে। এটা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের আরেকটি ধূর্ত চাল। কারণ, পাকিস্তানের অন্য সব ভাষায়ই আদি থেকে আরবী হরফ ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ পরিবর্তনের বিষয়টি প্রযোজ্য ছিল কেবল বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে। পাকিস্তানীরা সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের কাহিনী ফাঁদল যে, বাংলা সাহিত্য এমন কি অক্ষরগুলো নাকি হিন্দুয়ানী বা পৌত্তলিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কাজেই এই অক্ষরের সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামী হরফ মিলেমিশে থাকতে পারে না। পাকিস্তানীরা আরবীকরণের মধ্যে বাংলা ভাষার উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু বাংলার মানুষ দেখছিল কেবলই নিজ ভাষার অপমান ও ধ্বংস। তাই এই নতুনতম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রাম নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করল।

পুরো ৫০ এর দশকব্যাপী বাংলা ভাষার আরবীকরণের প্রক্রিয়া জোরদার করা হতে থাকে। পাকিস্তানীদের এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদেরকে একটি অশিক্ষিত শ্রেণী হিসাবে রেখে তাদের শোষণ পাকাপোক্ত করা। কারণ, আরবী হরফ ছিল বাংলার মানুষের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হরফ, যা ছিল এ অঞ্চলের মানুষের জন্য নতুন করে শেখার বিষয়। এমনকি বাংলার শিক্ষিত সমাজের জন্যও বিষয়টি ছিল ততখানিই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ যতখানি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ তা ছিল অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য। পাকিস্তনীদের উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। তারা প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতিযোগিতার বাইরে রেখে এ দেশে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে চাচ্ছিল। পাকিস্তানীরা কোনভাবেই বাঙালীদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগির বিষয়টি চিন্তায় ঠাঁই দেয়নি। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য আন্দোলনরত ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে হত্যার পরও এমন কি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার পরও পাকিস্তানীদের এ ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি, বরং নতুন নতুন রূপে আরও শক্তিশালী হয়ে বাংলার ওপর আঘাত হেনেছে। তাই বাঙালীকে এক পর্যায়ে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে বিদেশী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর বাংলাবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড তীব্রতর হলো। আইয়ুব-মোনায়েম চক্র এক পর্যায়ে ঢকা বেতারে ও পরবর্তী সময়ে টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করল। রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত বর্জন করা হয়। মানুষের মধ্যে বিকৃত ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংখ্যালঘু, বিশেষত হিন্দুবিদ্বেষী প্রচারণা চালানো হতে থাকল অতি কৌশলে। এ সময়ই অনেক হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ভিটামাটি ছেড়ে ভারতে চলে গেল। তৃণমূল পর্যায়ের মুসলিম লীগ নেতারা হিন্দুদের জমিজমা দখল করতে লাগল। অপরদিকে দেশছাড়া হিন্দুদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত করার আইনী প্রক্রিয়া চলতে থাকল। বাংলার মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্য সকলেই যে একই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই মূল্যবোধে মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য এ দেশের শিক্ষিত ও উদারপন্থী সমাজ তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তীব্র গণআন্দোলন গড়ে

তুলল। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতৃত্বে থাকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে শ্রমিক লীগ, যেখানে ত্যাগী অনেক ছাত্র নেতা সর্বক্ষণিকভাবে শ্রমিকদের একতাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেত। পুরো ষাটের দশকে শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, অবদুল কুদ্দুস মাখন, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ ছাত্র নেতাদের সংগ্রামী ভূমিকা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি সীমাহীন আনুগত্য আমাদের জাতির স্বাধীনতার সকল সংগ্রামকে সফল করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এদের মধ্যে অনেকেরই পরবর্তী রাজনৈতিক ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও, স্বাধীনতার জন্য এঁদের অবদান চিরভাস্মর হয়ে থাকবে।
অপরদিকে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরপরই অনেকগুলো ব্যবস্থা নেয়া হয় যা ছিল বাংলা ভাষাকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করে যাওয়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। সরকারী দলিলাদি, স্ট্যাম্প, পোস্ট কার্ড, যানবাহনের টিকেট, ব্যাংকনোট, ইত্যাদি প্রস্তুত করা হতে থাকে উর্দু ও ইংরেজী ভাষায়, যা অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যাবহারের অনুকূল ছিল না। এমন কি পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিলেবাস থেকে আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত থাকা বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে দেয়! উপরন্তু, পিএসসি ১৯৪৭ সালের নবেম্বরের সিভিল সর্ভিস পরীক্ষার সিলেবাসে ৯টি ভাষার যে লিস্ট প্রস্তুত করে সেখান থেকেও বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়া হয়। এগুলো ছিল বাঙালীদের বিরুদ্ধে চরমতম উস্কানি।

বাংলার মানুষের নিজের মাতৃভাষার অধিকার আদায় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার এই সংগ্রাম ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু হয়ে পাকিস্তান আমলে আরও অনেক বেশি সুসংহত হয়। আপাতদৃষ্টে এটিকে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন মনে করা হলেও এটি ছিল একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন- যার পটভূমি রচিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের আশা-আকাক্সক্ষার প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের পথ ধরেই। ইতিহাসের বহু পথ-পরিক্রম করে ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে, যেদিন ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার রাজপথ। সেই সঙ্গে লিখিত হয় বাঙালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়টি। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয়, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের ঘনঘটা। ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামের স্রোতধারা বেগবান হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে থাকে শত্রুর সকল প্রতিরোধের দুর্গ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার আন্দোলন অবির্ভূত হয় বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিনিয়ে আনে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে। পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান পরাভূত হয়। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে দেশের মানুষ দেশ শাসনের অধিকার দেয়। পাকিস্তানীদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে তার বহু শতাব্দীর কাঙ্খিত স্বাধীনতা।

আমাদের বিজয়ের পথ ছিল ষড়যন্ত্রের বিষে পিচ্ছিল ও কন্টকময়। সেই ষড়যন্ত্র হত্যা করেছে জাতির জনককে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী নেতাদের, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে। পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দাদের চর-অনুচরের দল কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই আমাদের নেতৃত্বের ও নীতি নির্ধারকদের কাছাকাছি অবস্থান করে নেয় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের মতো আরেকটি ধর্মান্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই হত্যা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পারিবার ও তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন সহকর্মীদের, ঘটানো হয় পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডগুলোকে: জেলখানায়, জনসভায়, সেনানিবাসে, এমনকি প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে। দীর্ঘ ২৬ বৎসর আমাদের জন্মভূমি পদদলিত হতে থাকে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী ক্ষমতা দখলকারী ও তাদের দোসরদের দ্বারা। হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করে তাদেরকে বাংলাদেশের রক্তস্নাত পতাকাকে পদদলিত করার সুযোগ করে দেয় এ সকল পদলেহীর দল। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, ব্যবসা বাণিজ্যে, অর্থনীতির আনাচে-কানাচে সর্বত্র এখনও এদের অবাধ বিচরণ বিদ্যমান। সময়মতো এরা আবার আবির্ভূত হবে স্বমূর্তিতে।

শঙ্কর তালুকদার
ভাষার লড়াই বিশ্বজুড়ে, বাংলার লড়াই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে !
(সাড়া বিশ্বের মাতৃভাষা আন্দোলনের তথ্যসমৃদ্ধ ২১শে ফেব্রুয়ারীর শ্রদ্ধা)

ভাষা হল মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা যা বাগযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থবাহী বাক সংকেতে রূপায়িত হয়ে ধ্বনিভিত্তিক প্রকাশে মানুষের মনের ভাব ব্যক্ত করতে এবং একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। 'ভাষার জন্য আন্দোলন' কিংবা 'আন্দোলনের অন্যতম উপলক্ষ ভাষা' – এমনভাবে অধিকার আদায়ের আন্দোলন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীর মধ্যে হয়েছে, যা কিনা কোথাও অহিংস আবার কোথাও সহিংস আকারে আন্দোলিত হয়েছে। আবার স্বাধীন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষির জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজ নিজ মাতৃভাষার অধিকারে লড়াই হয়েছে এবং এখনো চলছে সভ্য মানুষের উন্নয়ন মুখর সভ্যতার মধ্য দিয়েই।

তোমার ভাষা তোমার কাছে হৃদয় ছুয়ে ছন্দে
আমার ভাষা আমার কাছে জীবনের আনন্দে
সবার ভাষা সবার কাছেই প্রকাশের উচ্ছাসে
মর্যাদাও তেমনই তাঁর মায়ের রূপে ও সুভাষে!!

বঙ্গীয় সমাজ জীবনে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অম্বেষায় যে ভাষা আবেগ ও চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, তারই সূত্র ধরে ৪৭ এর স্বাধীনোত্বর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রথম পাকিস্তানের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরূদ্ধে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলা ভাষাও তেমন আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ও মর্যাদার মাঝে বিরাজ করে চলেছে। এরই মাঝে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপলক্ষ, উদ্‌যাপন ও ভাষার উন্নয়নের কাজ রূপায়িত করার মানসিকতা তৈরিতে এ আন্দোলনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি 'মাতৃভাষা দিবস' বা 'শহীদ দিবস' হিসেবে, এবং একই সাথে একটি রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসটি আরো নানাভাবে উদযাপিত হয়, যার মধ্যে আছে, মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌যাপন, যা একুশে বইমেলা নামে সমধিক পরিচিত। এছাড়াও ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারীদের ত্যাগের সম্মানে এ মাসেই ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় বেসামরিক পদক 'একুশে পদক'।

মানুষের ভেতর একুশের আবেগ পৌঁছে দিতে একুশের ঘটনা ও চেতনা নিয়ে রচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কবিতা ও চলচ্চিত্র। তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত ও আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারী'! ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সূচিত হয়ে আসছে। অগুনিত দুই বাংলার সে সব সৃষ্টির মধ্যে আছে - শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী রচিত নাটক 'কবর'; কবি শামসুর রাহমান রচিত কবিতা 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯; জহির রায়হান রচিত উপন্যাস 'একুশে ফেব্রুয়ারি'; বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান রচিত 'আর্তনাদ'! এছাড়া ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে জহির রায়হান পরিচালিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'।

“আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, ...আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই...” শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে গানটা, বা আমরি বাংলা ভাষা কবিতায় কবি অতুল প্রসাদ সেন লিখেছেন-

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা !
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা !
কী যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ।।
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা ।।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন

ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনারটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে রাত্রির মধ্যে তা’ সম্পন্ন করে। সেটিকে বিনষ্ট করে ভেঙ্গে ফেলার ২ বছর পর ১৯৫৪ সালে নিহতদের স্মরণে নতুন একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় বড় পরিসরে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু করা হয়। নতুন শহীদ মিনারের স্থপতি ছিলেন হামিদুর রহমান এবং নভেরা আহমেদ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল চত্বরে বড় আকারের এই স্থাপনাটি নির্মাণ করা হয়। মূল বেদির উপর অর্ধ-বৃত্তাকারে সাজানো ৫টি স্তম্ভের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মাতৃ ভাষা তার শহীদ সন্তানদের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কারণে স্থাপনাটির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আবুল বরকতের মা হাসনা বেগম শহীদ মিনারটির উদ্বোধন করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী এটি ভেঙ্গে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এটি পুনরায় নির্মাণ করে! আন্দোলনের বিশ্বব্যাপি পরিসংখ্যান ও বর্ষপঞ্জি রচনা করলে দেশে দেশে সেই চিত্র ফুটে উঠবে মাতৃভাষার সম্মানে ও জীবনের সাথে ভাষার একাত্মতার প্রমান হিসেবে!

একদম ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে সম্মান দিতে গেলে দেখা যায় কিংবদন্তি আছে যে ১৭৯৫ সালের মহাসভা সম্পর্কিত বিতর্কে ইংরেজি শুধুমাত্র একক ভোটে জার্মানকে পরাজিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হয়ে ওঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র ইংরেজিভাষা ও তার প্রতিষ্ঠা নিয়ে মার্কিনিরা ওদেশের সরকারী কার্যক্রমে ইংরেজিকে একমাত্র ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল ! বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির আংশিক শোষণ ও বসবাসের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কখনই একটি সরকারী জাতীয় ভাষা ঘোষণা করার আইনগত নীতি ছিল না। কেবল কিছু সময়ে এবং জায়গায়, ইংরেজির ব্যবহার বা প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেমন নেটিভ আমেরিকান বোর্ডিং স্কুলে, আর তারই অবসান ঘটেছিল ঐ ভোটভীত্তিক ভাষার লড়াইর পর ! পূর্বে সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকে চীনে ম্যান্দারিন-মাঞ্চুরিয়ান বিরোধ ইত্যাদি নানাভাবে নানা রূপে জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ভাষা।

অপরদিকে সময়ের নিরিখে দেশ ও মাটির ছোঁয়া ভরা মাতৃভাষাকে নিজ সম্মানে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সাড়া পৃথিবীর নথীভূক্ত আন্দোলনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে নরওয়ে ও ডেনমার্কের ভাষা সচেতনতা ও লড়াই-এর ইতিহাসই প্রাচীনতম । আর নরওয়েইয়ান ভাষার সংঘাত (নরওয়েইয়ান: ডেনিশ) নরওয়েইয়ান ভাষার লিখিত সংস্করণের সাথে সম্পর্কিত নরওয়েইয়ান সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে একটি চলমান বিতর্ক।

১৫৩৬/১৫৩৭ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত, ডেনমার্কের সাথে রাজনৈতিক মিলনের কারণে ড্যানিশ ভাষাই নরওয়ের প্রমিত লিখিত ভাষা ছিল, যে সময়ে ডেনিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উভয়ই ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, যখন সংসদ সিদ্ধান্ত নেয় যে ডেনিশের উপর ভিত্তি করে একটিকে বোকমাল (আক্ষরিক অর্থে "বই ভাষা") বলা উচিত এবং নরওয়েইয়ান উপভাষার উপর ভিত্তি করে একটিকে বলা উচিত নয়নর্স্ক ("নতুন নরওয়েইয়ান")।

দেশ ছোট বা তেমন ভাবে বিশেষত্ব না থাকলেও ভাষা নিয়ে জাতীয়তা বোধ বা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মত সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে নেপালী ভাষা যা নেপালের প্রকৃত অধিবাসী নেওয়ারদের লড়াইও প্রাচীনতম ভাষা আন্দোলনের অন্যতম উদাহরণ! ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে নেপালের শাহ রাজবংশের উত্থানের সাথে শুরু হওয়া রাষ্ট্র কর্তৃক ভাষার দমনের বিরুদ্ধে প্রকৃত অধিবাসীদের মধ্যে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে এবং রানা শাসনামল (১৮৪৬-১৯৫১) এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (১৯৬০-১৯৯০) এর সময় যা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। অধিকন্তু, কাঠমান্ডু উপত্যকায় ব্যাপক অভিবাসনের পর প্রতিবেশীদের ভাষার প্রতি শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে আদিবাসী নেওয়াররা তাদের স্বদেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৯১ সময়কালে, নেপাল ভাসাভাষী উপত্যকার জনসংখ্যার শতাংশ ৭৪.৯৫% থেকে ৪৩.৯৩% এ নেমে আসে! এর ফলে লড়াইএর স্বীকৃতিতে ভাষাটিকে ইউনেস্কো দ্বারা "অবশ্যই বিপন্ন" হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১৯২২সাল থেকে আয়ারল্যান্ডের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে আইরিস ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হলেও প্রকৃত পক্ষে ১৯শ শতকের শেষে এসে ভাষাটির সাহিত্যিক নবজাগরণ ঘটে। উল্লেখযোগ্য, ১৭শ শতক পর্যন্তও আয়ারল্যান্ডে কেবল আইরিশ গালীয় ভাষাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইংরেজদের আধিপত্যের কারণে এবং ১৯শ শতকে দেশত্যাগের কারণে ভাষাটির প্রচলন কমে যায় । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আইরিশ গ্যালিক নামেওপুনরুজ্জীবিত এবং আইরিশ গ্যালিক সংস্কৃতির (লোককাহিনী, খেলাধুলা, সঙ্গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি সহ) আগ্রহের জাতীয় পুনরুজ্জীবন ঘটে। আইরিশ একটি কথ্য ভাষা হিসাবে হ্রাস পেয়েছিল, শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ এলাকায় প্রধান দৈনিক ভাষা অবশিষ্ট ছিল, ইংরেজি আয়ারল্যান্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে প্রভাবশালী ভাষা হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভাষাটির পুনরুজ্জীবনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এরপরেই উল্লেখ করতে হয় আফ্রিকান ভাষা আন্দোলন, যেটি ১৯ শতকের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় উদ্‌ভূত প্রথম ভাষা আন্দোলন ! আফ্রিকান ভাষা আন্দোলন ১৮৭৫ সালে শুরু হয়েছিল, স্টেফানাস জ্যাকবুস ডু টোইটের প্রচেষ্টায় আফ্রিকানদের ডাচ থেকে আলাদা ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম আফ্রিকান সংবাদপত্র, ডাই আফ্রিকানস প্যাট্রিয়ট, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে! আফ্রিকায় পরবর্তী ভাষা আন্দোলনটি যেটিকে ঐ মহাদেশের দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলন বলা হয় সেটি ১৯০২ সালে দ্বিতীয় অ্যাংলো-বোয়ার যুদ্ধে বোয়ার্সদের পরাজয়ের পরে উদ্ভব হয়। কেপ প্রদেশ থেকে এই অন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, এটি ডাচদের উপর আফ্রিকানদের উর্ধ্বগতির দিকে পরিচালিত করে এবং স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পরবর্তী ভাষাটিকে প্রতিস্থাপিত করে। ডাচ সংস্কারকৃত গীর্জা এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার সহ-অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

এরপর ১৯৯৪ সালে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃতে ওদেশের বর্ণবৈষম্যের অবসানের পর, দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকানদের মর্যাদা অনেক কমে গিয়েছিল, এবং শুধুমাত্র ইংরেজির সমান থেকে নেমে গিয়ে ১১ টি সরকারী ভাষার মধ্যে মাত্র একটিতে এসে দাড়ায়, যার ফলে জনসাধারণের ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রাধান্য বৃদ্ধি

পায়। আফ্রিকানদের এই আপেক্ষিক প্রান্তিকতাকে বদলানোর প্রচেষ্টাকে ওদেশের তৃতীয় ভাষা আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষার দাবিতে তৎকালীন বর্ণবাদী সরকার প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে যাওয়া ছাত্রদের মিছিলে গুলি করে। শতাধিক মানুষ নিহত হয় এর বেশিরভাগই ছিল শিশু-কিশোর।ভাষার মর্যাদায় দক্ষিণ আফ্রিকায় এই দিনটিকে বিশেষ মর্যাদায় স্মরণ করা হয়।

ইলিরিয়ান আন্দোলন যা কিনা ক্রোয়েশিয়ান- স্লোভেনিয়ান ছিল একটি প্যান দক্ষিণ স্লাভিস্ট সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রচারণা যার শিকড় ছিল প্রাথমিক, আধুনিক যুগে এবং প্রথম যুগে একদল তরুণ ক্রোয়েশিয়ান বুদ্ধিজীবী দ্বারা যা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভাষাগত ও জাতিগত ঐক্যের মাধ্যমে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে একটি ক্রোয়েশিয়ান জাতির প্রতিষ্ঠা তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে ইলিরিয়ান শব্দের পুনরুজ্জীবিত ছাতার অধীনে সমস্ত দক্ষিণ স্লোভাকদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্য করণের ভিত্তি স্থাপন করা।

পুনর্মিলনবাদ-গ্যালিসিয়ার একটি ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা গ্যালিসিয়ান এবং পর্তুগিজকে একক ভাষা হিসাবে দেখে । অন্য কথায়, আন্দোলনটি অনুমান করে যে গ্যালিসিয়ান এবং পর্তুগিজ ভাষাগুলি শুধুমাত্র একটি সাধারণ উত্স এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে ভাগ করেনি, কিন্তু বাস্তবে তারা আজও একই ভাষার রূপ। এই অনুসারে, গ্যালিসিয়াকে পর্তুগিজ ভাষা দেশগুলির সম্প্রদায়ের সাথে পুনরায় একীভূত করা উচিত। বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পর্তুগিজ এবং গ্যালিসিয়ানকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে দেখা উচিত, যাকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদ।

ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আন্দোলন, সাহিত্য ও রাজনৈতিক আন্দোলন যা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বা নর্ডিক দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার সহযোগিতাকে সমর্থন করে, যাকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ানিজম বা প্যান-স্ক্যান্ডিনেভিয়ানিজমও বলা হয়, এমন একটি আদর্শ যা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার সহযোগিতাকে সমর্থন করে। স্ক্যান্ডিনেভিজম সাহিত্য, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নিয়ে গঠিত যা একটি ভাগ করা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অতীত, একটি ভাগ করা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, একটি সাধারণ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পুরাণ এবং একটি সাধারণ ভাষা বা উপভাষা ধারাবাহিকতা প্রচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং যার ফলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্য ও ভাষার সমর্থনে যৌথ সাময়িকী এবং সমিতি গঠিত হয়।একটি আধুনিক ভাষা ও জাতি আন্দোলন হিসেবে প্যান-স্ক্যান্ডিনেভিয়ানিজমের উদ্ভব হয় ১৯ শতকে। নর্ডিসিম আইসল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ড অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ প্রসারিত করে ।

সেইরূপ, প্যান-স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আন্দোলন জার্মানি এবং ইতালির একীকরণ আন্দোলনের সমান্তরাল। এই আন্দোলনটি ১৮৪০-এর দশকে ডেনিশ এবং সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা শুরু হয়েছিল, যার একটি ঘাঁটি স্ক্যানিয়ায় ছিল। শুরুতে, দুই দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যার মধ্যে নিরঙ্কুশ ছিলেন রাজা অষ্টম ক্রাইস্ট এবং অপরদিকে চার্লস চতুর্দশ এমন "এক ব্যক্তি এক সরকার" সহ আন্দোলনের প্রতি সন্দিহান ছিলেন। আন্দোলনটি ১৮৪৬ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে বিদ্যমান ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত সেটি হ্রাস পায় এবং শুধুমাত্র ফিনল্যান্ডের সুইডিশ-ভাষী জনসংখ্যার মধ্যে শক্তিশালী সমর্থন নিয়ে অবস্থান করে।

প্যান-স্ক্যান্ডিনেভিয়ানিজমের পতন ঘটে ১৮৬৪ সালে যখন দ্বিতীয় শ্লেসউইগ-হোলস্টেইন যুদ্ধ শুরু হয়। রাজা চার্লস ১৫ যিনি ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৭২ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুইডেন ও নরওয়ের রাজা ছিলেন, প্যান-স্ক্যান্ডিনেভিযানবাদকে সমর্থন করা সত্ত্বেও যুদ্ধে তিনি ডেনমার্ককে সাহায্য করতে ব্যর্থ হন। লেখক হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন ১৮৩৭ সালে সুইডেন সফরের পর স্ক্যান্ডিনেভিজমের অনুগামী হয়ে ওঠেন এবং সুইডিশ, ডেনিস এবং নরওয়েজিয়ানদের সম্পর্ক প্রকাশে একটি কবিতা লেখেন । প্রথম সেই

ভাষায় তাঁর কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন, “জেগ এর এন স্ক্যান্ডিনেভ”   ("আমি একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান")। অ্যান্ডারসনের লেখা একটি কবিতা সেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জাতীয় সঙ্গীতের অংশ হিসাবে "নর্ডিক চেতনার সৌন্দর্য, যেভাবে তিনটি ভগিনী জাতি ধীরে ধীরে একত্রে বেড়ে উঠেছে" ক্যাপচার করার জন্য কবিতাটি রচনা করেছিলেন।সুরকার অটো লিন্ডব্লাড কবিতাটিকে সঙ্গীতে সেট করেন এবং রচনাটি ১৮৪০ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ সালে এর জনপ্রিয়তা শীর্ষে পৌঁছেছিল, পরবর্তীতে এটি খুব কমই গাওয়া হয়েছিল।

ফরাসী ভাষী কানাডার স্বাধীনতার আন্দোলন ১৯৬০ সাল থেকে আজও চলেছে। ইংরাজী ভাষা অধ্যুষিত বাকি অংশ থেকে সার্বভৌমত্ব লাভ করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। কানাডার পূর্ব অংশের অঙ্গরাজ্য কুইবেকের রাজনীতিতে ভাষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এই অঞ্চল এক সময় সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রশ্নে স্বাধীনতা চেয়েছিল। অবশ্য সে আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই ক্ষয়ে গেছে তবে রাজনৈতিক লড়াই অব্যহত রয়েছে।

ভাষার প্রশ্নে চরম জাতীয়তাবাদের স্বরূপ দেখিয়েছে লাটভিয়ানরা। রুশ ভাষাকে দ্বিতীয় দাপ্তরিক ভাষা করার প্রশ্নে ২০১২ সালে সেদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে স্পষ্ট ব্যবধানে রুশ ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করেন লাটভিয়ানরা। যদিও রুশ সাম্রাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ থাকাকালে কয়েকশ বছর ধরে রুশ ভাষাই ছিল লাটভিয়ার প্রধান।

মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন ১৯১২ সালে শুরু হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভূমের বাঙালিদের মধ্যে। মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীতে ঘটা দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল। শুরু হয় পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে ভাষার নামে ঐতিহাসিক পদযাত্রা। লাবণ্যপ্রভা দেবী ও অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সহস্রাধিক মানুষ সামিল হন এই পদযাত্রায়। পাকবিড়রা থেকে কলকাতা দীর্ঘ ৩০০ কিলোমিটার পথে কত গ্রাম, কত গঞ্জ, কত জনপদ। অভ্যর্থনার জন্য মোড়ে মোড়ে কত তোরণ। জনতা সত্যাগ্রহীদের সংবর্ধিত করছেন পুষ্পস্তবক দিয়ে। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’   আবেগরঞ্জিত সঙ্গীত। মাতৃভাষার প্রতি ওই ভালবাসা, ওই নাড়িছেঁড়া টান আজও স্মরণে আছে বহু প্রবীণের। ১৯৫৬ এর ৬ মে ওই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কলকাতায় পৌছায়।

‘বাংলা ভাষার পদবিতে
কোন ভেদের কথা নাই।
এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে
মাতৃভাষার রাজ্য চাই’।

ভাষা আন্দোলনের টুসু গান হয়ে উঠেছিল শানিত।

১ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে সৃষ্টি হল পুরুলিয়া জেলা। পুরুলিয়ার বিহার ছেড়ে বাংলায় অন্তর্ভুক্তি বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জয়। অথচ, আমাদের অবহেলায় এই ইতিহাস বিস্মৃতির পথে।আমরা ভুলিনি। যেমন ভুলিনি আসামের বরাক উপত্যকায় সংগঠিত বাংলাভাষী মানুষের ভাষা আন্দোলন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে এই ভাষা আন্দোলনে ১১ জন শহিদ হন। ফলে, আসাম সরকার ১৯৬০ সালের ভাষা আইন সংশোধন করে ১৯৬১ সালে বরাকের জন্য বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাই আজও বরাকে সরকারি কার্যালয়ে বাংলার ব্যবহার আইনসম্মত।

ভাষাভিত্তিক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ঐহিত্যের গর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও কম নয়। এর মধ্যে ওডিশা, কর্নাটক, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র অন্যতম। কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দি চাপানোর স্পষ্ট প্রতিবাদ হিসেবে মহারাষ্ট্র সরকার স্থানীয় বিভিন্ন ভাষাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক করেছে। দক্ষিণ ভারতে ভাষার জন্য প্রথম রাজনৈতিক প্রতিবাদ হয় ১৯৩৭ সালে। তৎকালীন ব্রিটিশ রাজের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্থানীয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সরকারস্কুলে হিন্দি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে এ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৫-১৯৬৭ তামিলনাড়ুতে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যপি প্রায় দুইমাস যাবত দাঙ্গা হয়, বিশেষ করে মাদ্রাজে। শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়। সারা দক্ষিণ ভারত বিশেষভাবে তামিলনাড়ু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে আত্মাহুতির ঘটনাও ঘটে। আন্দোলনে বিধানসভা নির্বাচনে আন্দোলনের পক্ষাবলম্বনকারী রাজনৈতিক দলগুলো বিজয়ী হয়। এর ফলে তামিলনাড়ুতে ডিএমকে ক্ষমতায় আসে এবং কংগ্রেস প্রায় নিশ্চহ্ন হয়ে যায়- শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে হিন্দির সঙ্গে ইংরেজিকেও ব্যবহারিক সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বর্তমানে ভারতে ২২টি ভাষা সরকারের তালিকাভুক্ত এবং ৪টি ভাষাকে ঐতিহ্যবাহী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যদিও দেশটিতে মোট ভাষার সংখ্যা শ’ খানেক। কেন্দ্রীয়ভাবে দাপ্তরিক ভাষা হিন্দি ও ইংরেজি।

উর্দু আন্দোলন- একটি সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন যার লক্ষ্য উর্দুকে সর্বজনীন ভাষা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা। ১৯ শতকের মাঝামাঝি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সাথে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, যা স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের আলীগড় আন্দোলনের দ্বারা ইন্ধন দেওয়া হয়েছিল। এটি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

হিন্দুস্তানি হিন্দি ও উর্দু হল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান ভাষা, ভারত ও পাকিস্তানে হিন্দি এবং উর্দু এর প্রমিত আকারে ফেডারেল মর্যাদা বিরাজ করছে। এটি নেপাল, বাংলাদেশ এবং পারস্য উপসাগরে একটি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ব্যাপকভাবে কথ্য ও বোঝা যায় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে এটি একটি ভাষা ফ্রাঙ্কা হিসাবে বিবেচিত হয়। মোট বক্তার সংখ্যার দিক থেকে এটি বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে একটি। এটি উত্তর ভারতে বিকশিত হয়েছিল, প্রধানত মুঘল সাম্রাজ্যের সময়, যখন ফার্সি ভাষা মধ্য ভারতের পশ্চিম হিন্দি ভাষাগুলিতে শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল; হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে এই যোগাযোগের ফলে দিল্লিতে কথ্য ভারতীয় উপভাষার মূল ইন্দো-আর্য শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়, যার প্রাচীনতম রূপটি ওল্ড হিন্দি নামে পরিচিত, ফার্সি ঋণ শব্দ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

বেলুচ স্বাধীনতা আন্দোলন, একটি আন্দোলন যা বেলুচ জনগণকে দাবি করে, একটি জাতি-ভাষাগত গোষ্ঠী যা প্রধানত পাকিস্তান, ইরান এবং আফগানিস্তানে পাওয়া যায়। বেলুচিস্তানের ইতিহাসও বাংলাদেশের মত তারা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত, অনেক বৈষম্যের শিকার তারা,খন্ড খন্ড লড়াই চলে। তাদের স্বাধীনতার ইতিহাস ১৯৪৮ সাল থেকে, তারা নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছিল এবং বিচ্ছিন্ন করে তিনটি প্রশাষনিক ভূখন্ডের অংশ হিসেবে খন্ডিত হয়েছিল। পরিশেষের কথা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহমিকায় আমরা যেন আমাদের ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীগুলোর কথা ভুলে না যাই। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষার দায়িত্বও সংখ্যাগরিষ্ঠের এটি যেন আমরা ভুলে না যাই।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ করে। এর কিছুদিন পরেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা জিন্নাহ নিজে গণপরিষদে বলেন, মুসলিম, হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ কিংবা পাঞ্জাবি-বাঙালি-মিল্কি-পাখতুন পরিচয় ভুলে সকলকেই এখন এক পাকিস্তানি হতে হবে। কিন্তু সেই পাকিস্তানের ঐক্যসূত্র তৈরি করতে গিয়ে তারা ইসলাম ও উর্দুভাষার উপর জোর দেন । এমনকি বাংলাভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল ,বঙ্কিমের মত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের প্রতি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বৈরি অবস্থান গ্রহণ করে। অথচ বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া ছিল যুক্তিযুক্ত। পাকিস্তানের তত্ত্বকালীন মোট জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ এর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বাঙালি। বাকি আড়াই কোটি মানুষের মাতৃভাষাও উর্দু ছিল না। তাই জিন্নাহর এই অযৌক্তিক দাবির কারণে ভাষা আন্দোলন হয়। নতুন আইন নিয়ে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং ব্যাপক অসন্তোষের মুখে সরকার জনসভা ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা আইন অমান্য করে এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি বিক্ষোভের আয়োজন করে। আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যখন পুলিশ সেদিন বেপরোয়া গুলি চালিয়ে বিক্ষোভকারীদের হত্যা করেছিল। শহীদের মৃত্যু ও মৃতদেহ লোপাট করে প্রশাসন ব্যাপক নাগরিক অস্থিরতা উস্কে দেয়। বছরের পর বছর সংঘর্ষের পর, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে সরকারী মর্যাদা প্রদান করে।

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলা এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয় পরিচয়ের দাবিকে অনুঘটক করে এবং ৬-দফা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ সহ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে ওঠে।২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন দিবস হিসেবে পালিত হয়, একটি জাতীয় ছুটির দিন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে যে শহীদ মিনার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয় আন্দোলন ও এর শহীদদের স্মরণে; সেটিকে ঘিরে উৎসবের মন্ডপ ও মেরাপ বেঁধে জমকালো সরকারী সম্মান জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজুড়ে এত জাতি, এত দেশ তাদের মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করে সংগ্রাম কর, প্রাণ বিসর্জন দিল। কিন্তু মাতৃভাষার সম্মানে ধারাবাহিক আন্দোলন ও সাড়া বিশ্ব কাঁপিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জন্য দেবার সম্মানে বাংলাভাষা রক্ষার এই অনন্ত লড়াইকে ১৯৯৯ সালে, ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, ভাষা আন্দোলন এবং বিশ্বব্যাপী মানুষের জাতিগত-ভাষাগত অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এই দিনটিকে !

র.আমিন

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে

শৈশবে পন্ডিত মশায়ের কাছে শিখেছিলাম, বাংলা ভাষার প্রকারভেদ দুটো- সাধু রূপ ও চলিত রূপ। ভাষার এই প্রকারভেদের আলোকে প্রথমত আলোচনা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে ভাষার প্রায়োগিক রূপ নিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে।

'বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্রহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নিচে কলিকাতা শহর একটা প্রকান্ড নিরানন্দ কুকুরের মত লেজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলি পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে।'

উপরের এই উদ্‌ধৃতিটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গোরা" উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এটি সাধু ভাষার একটি সঠিক রূপ। উদ্‌ধৃতিটির বিশ্লেষন করলে বাংলা ভাষার মৌলিক ব্যাকরণগত উপাদান সমূহের প্রয়োগ আমরা দেখতে পাবো। একথা বলা মূলত অত্যুক্তি হবে না যে, সাধু ভাষার এই রূপ প্রকৃত বিচারে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত নেই । বস্তুতঃ কোলকাতার বাবুরা বাংলা ভাষার সাধুরূপের কিয়দাংশ বজায় রাখতে স্বচেষ্ট হলেও, শব্দগত অনেক বিকৃত রূপ প্রকাশ পায় তাতে। কোলকাতাবাসীদের মুখে তাই আজও আমরা শুনতে পাই-

'নারায়ণ কহিল, ধম্ম-কম্ম বুঝিনা ।'

এখানে বলিল-এর জায়গায় 'কহিল' এবং ধর্ম-কর্ম জায়গায় 'ধম্ম-কম্ম' ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার হরিদাসদের মুখে শোনা যায়-

'রাজধানীতে গিয়েছিলুম ।'

এখানে গিয়েছিলাম-এর জায়গায় 'গিয়েছিলুম' ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুতাপের বিষয় বাংলা ভাষার মৌলিকত্ব পুরোপুরি কোথাও প্রচলিত নেই। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় চলিত রূপটিই অক্ষুণ আছে। বলা বাহুল্য, চলিত রূপটির দ্বারাই আমাদের কৃষ্টির মানদন্ড বিচার করা হয়।

'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভেতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরী করতে বসেন।'

উল্লেখিত উদ্‌ধৃতিটি সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর "সাহিত্যে খেলা" প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে, এখানে আমরা চলতি রূপের প্রয়োগিক রূপ দেখতে পাচ্ছি। মূলতঃ চলিত ভাষার প্রয়োগ শুধুমাত্র বর্তমান সাহিত্যেই অথবা ক্ষেত্রবিশেষে শহরের কৃষ্টিতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে। বর্তমানে চলিতভাষার যে রূপ তাকে আর বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গরূপ বলা চলে না। কারণ আমাদের প্রচলিত ভাষার অভ্যন্তরে অন্যান্য অনেক ভাষার প্রতিশব্দগুলোর অনুপ্রবেশ হওয়াতে আমরা মুল বাংলা ভাষা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। যেমন-

- **Sunrise Pre-cadet এ ভর্তি চলছে।**
- **প্রার্থীকে অবশ্যই সুদর্শন ও Smart হতে হবে।**
- **Show room-এর জন্য যোগাযোগ করুন।**

উপরের এই তিনটি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যে আমরা দেখতে পাই Sunrise Pre-cadet দ্বিতীয় বাক্যে Smart এবং তৃতীয় বাক্যে Show room এই তিনটি ইংরেজী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাক্য তিনটি এই আধুনিক যুগে আজ আমাদের কাছে স্বাভাবিক। সচরাচর এই বাক্যগুলি তথা এমন অজস্র বাক্য আমরা মুখে বলছি অথবা রাস্তাঘাটে অহরহ দেখতে পাচ্ছি। বিষয়টির একটু গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাব, উল্লেখিত বাক্য তিনটি আর বাংলা ভাষার কোন রূপ বজায় রাখতে পারেনি, হয়ে গেছে সংমিশ্রিত ভাষা। তাহলে দৃশতঃ বিষয়টা দাঁড়াল আমরা একটি সংমিশ্রিত ভাষাকে আমাদের ভাষার চলিত রূপ হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছি। এখন যদি আমরা বাক্য তিনটিকে বিপরীত ভাবে সাজাই তাহলে কি দাঁড়াবে -

- **ভর্তি is going on Sunrise Pre-cadet.**
- **প্রার্থী has to be handsome & smart.**
- **যোগাযোগ for show room.**

এই তিনটি বাক্য কি আমরা ইংরেজী কোন গ্রন্থে দেখতে পাব ? বাক্য তিনটি কি শুদ্ধ ? ইংরেজ জাতি কি এগুলো মেনে নেবেন ? সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর আসবে নেতিবাচক। কিন্তু আমরা আমাদের নেতিবাচককে মেনে নিলাম কোন যুক্তিকে ? এ জিজ্ঞাসা কর্তাব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে। ডাঃ হুমায়ুন আজাদ 'বাংলা ভাষার শত্রু-মিত্র' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। চলিত ভাষার এই রূপে, শুদ্ধ বা পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষার কোন রূপ নেই, সে স্থান দখল করে নিয়েছে এক অবাঞ্চিত সংমিশ্রিত ভাষা। পন্ডিত মশাই ভাষার যে প্রকারভেদ করেছিলেন, সেই শ্রেণীবিভাগে ভাষার আর একটি রূপ সংযোজন করা যেতে পারে- তাহলো আঞ্চলিক রূপ। একজন মনীষীর উক্তি প্রাসঙ্গিকভাবে না বলে পারছি না। তিনি বলেছিলেন, প্রতি দশ কিলোমিটার অন্তর মানুষের ভাষা পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিচার করলে আমরা তাই দেখতে পাই। প্রতিটি অঞ্চল ভেদে ভাষা পরিবর্তিত হচ্ছে। রাজশাহী অঞ্চলের ভাষার সাথে ঢাকা অঞ্চলের ভাষার যেমন কোন সাদৃশ্য নেই তেমনি চট্টগ্রামের সাথে খুলনার বৈসাদৃশ্য বিদ্যামন। এমন কি ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ভাষার সাথেও ঢাকার ভাষার কোন নিরঙ্ঁকুশ সাদৃশ্য নেই। অথচ সব অঞ্চলগুলোই বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আঞ্চালিক ভাষাতেও বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বক্তব্যটিকে যথার্থ ও যুক্তিনির্ভর করার প্রয়াসে এবারে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে বিষয়টাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

চট্টগ্রামের জনৈক মোহসীন মিয়া তার আঞ্চলিক ভাষায় বলেন,
'তুই এতক্কন আইসো দে? তোর লাই আই বসতে বসতে আই তারপরে বাজার গিয়ে। তুই আসছো দে আরে আস্তাতে ন দেখ? তুই এককিনি বইনি আই এক্কিনি গোছল করি আই।'
ভাষাটির চলিত রূপ দাঁড়ায়-
তুমি এতক্ষণে এসেছ? তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করে তারপর বাজার চলে গেলাম। তুমি আসার সময় আমাকে রাস্তাতে দেখ নাই? একটু অপেক্ষা করো আমি গোসলটা সেরে আসি।

নোয়াখালীর জনৈক শাজাহান মিয়া তার আঞ্চলিক ভাষায় বলেন,
'তাহের সাব বাইত নাই, হের হোর বাড়িতে গেছে। হের হোর বড্ডা বড়লোক, কত্ত জাগা জমির মালিক হে নিজেও কইতে পারবো না। হোর তো হারাদিন রাজনীতি করে, গ্রামের মাইনসে হেরে কয় বড্ডা রাজনীতিবিদ। গ্রামের্ত্যে তার বহুত নাম ডাক, হগগলে হেরে মান্য করি চলে।'
ভাষাটির চলিত রূপ দাঁড়ায়-
তাহের সাহেব এখন বাড়িতে নেই, তার শ্বশুর বাড়িতে গেছে। তার শ্বশুর বিরাট বড়লোক, কত জায়গা-জমির মালিক সে নিজেও বলতে পারবে না। তার শ্বশুর সারাদিন রাজনীতি করে, গ্রামের মানুষ তাকে বড় রাজনীতিবিদ মনে করে। গ্রামে তার বহু নাম-ডাক, সকলে তাকে মান্য করে চলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনৈক তাপস খন্দকারের ভাষায়,
'এই বেডারা দাশটারে শ্যাষ কইরা ফালাইব। দ্যাশ নিয়ে মাতা খারাপ কেল্লাইগা করে আমরা লাভ হতি কোনডাই বুঝি না। হামাকা হারাদিন আকামের ফেছাল নিয়া হুদু হুদু আমগাছ তলাডারে পেরেস কেলাবের মত বানাইলা।'
ভাষাটির চলিত রূপ দাঁড়ায়-
এই লোকগুলো দেশটা শেষ করে ফেলেবে। দেশ নিয়ে মাথা খারাপ কি জন্য করে আমরা লাভ ক্ষতি কোনটাই বুঝি না। শুধু শুধু সারাদিন অপ্রয়োজনীয় কথা বলে আমগাছের তলাটাকে প্রেসক্লাব বানিয়ে ফেলছে।

কিশোরগঞ্জের জনৈক মসলেহ উদীনের ভাষায়,
'বাজন কইছে তুমি অকনে বাইত যাইতা। বাজান বাজারতে আমার লাইগ্যা একটা গিলাফ আইনা দিও। নানা, মার শইল ভালা না, তুমারে কইছে তাড়াতাড়ি যাইতা। দাদা, আমারে কয়ডা টেহা দাও, মিষ্টি খাইতাম। এই ব্যাডা কেমনে কাম করছ ? কাম ভালা না অইলে টেহা দিতাম না।'
ভাষাটির চলিত রূপ দাঁড়ায়-
বাবা বলেছেন, তোমাকে এখনি বাড়িতে যেতে। বাবা, আমার জন্য বাজার থেকে একটা চাদর এনে দিয়ো। নানা, মার শরীর ভাল না, তোমাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। দাদা, আমাকে কিছু টাকা দিন, মিষ্টি খাব। এই ছেলে কিভাবে কাজ করছো ? কাজ ভাল না হলে টাকা দেব না।

রংপুরের জনৈক কছিমুদ্দিনের ভাষায়,
'মোর নাম কছিমুদ্দি, মোর বাড়ি অমপুর। চাইর বছর আগত ঢাকাত.আসছো, এটে আসি মোর কপাল ফাটছে। বাড়িত থাকাত যাও একনা খাবার পাইছিনু, এটে আসি তাও জোটে না। যত টাউট বাটপারের আড্ডা এই শহরত। সবাই দু'নাম্বার ধান্ধাত আন্ধা, কাম কাজ দেখি মুই ফিরি যাবার লাগছে।'
ভাষাটির চলিত রূপ দাঁড়ায়-
আমার নাম কছিম উদ্দিন, আমার বাড়ি রংপুরে। চার বছর আগে আমি ঢাকায় এসেছি, এখানে এসে আমার কপাল ফেটেছে। বাড়িতে থকতে যাও কিছু খেতে পেতাম, এখানে এসে তাও জোটে না। যত টাউট বাটপারের আড্ডা এই শহরে। সবাই দু'নম্বরে কাজে ব্যস্ত, কাজ কর্ম দেখে আমি ফিরে যাচ্ছি।

ঢাকার জনৈক বাসিন্দার ভাষায়,
'চেয়ারম্যান ভাববার লাগছে, মাগার আমারে ভোট না দিয়া যাইবা কই চান্দুরা ? আমি অইলাম গিয়া এই এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয়। এলাকার উন্নয়নের লাইগা জীবনডারে হুকনা পাতার নাহাল উড়াইবার লাগছি। তোমাগো চোখ দুইডা কি আন্ধা ? দেখবার পাওনা আমার কাজ কাম কেমন টগবগ টগবগ করতাছে? আমি বুঝবার পারছি তোমরা আমারেই ভোট দিবা।'
ভাষাটির চলিত রূপ দাঁড়ায়-
চেয়ারম্যান ভাবছে, আমাকে ভোট না দিয়ে সবাই যাবে কোথায় ? আমি হলাম গিয়ে এই এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয়। এলাকার উন্নয়নের জন্য জীবনটাকে শুকনা পাতার মতো উড়িয়ে যাচ্ছি । তোমাদের চোখ কি অন্ধ ? দেখতে পাও না, আমার কাজ কর্ম কেমন টগবগ করছে ? আমি বুঝতে পারছি, তোমরা আমাকেই ভোট দেবে ।

আমরা এতক্ষণ বাংলা ভাষার প্রচলিত তিনটি রূপ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি- উল্লেখিত তিনটি রূপের মধ্যে সাধুরূপের প্রচলন বা ব্যবহারিক প্রক্রিয়া কোলকাতার বাবুরা কিয়দাংশ বজায় রাখতে স্বচেষ্ট হলেও, তাতে অনেক বিকৃত রূপ প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, চলিত রূপের ব্যবহার যদিও প্রচলিত আছে, কিন্তু তা ভাষার স্বকীয় সত্তা বজায় রাখতে পারছে না। বিভিন্ন ভাষার প্রভাব তথা বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশে তার রূপ হয়েছে সংমিশ্রিত। তাছাড়া যে আঞ্চলিক রূপের উল্লেখ করলাম, সেটাতেই বাংলা ভাষার কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বক্তব্যটিকে সংক্ষিপ্ত করলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা আজ আর আমাদের ভাষা ও কৃষ্টিতে অবস্থান করছে না, আমাদের জাতির জন্য বিষয়টা খুবই লজ্জাজনক। অথচ আমরা ঐতিহাসিকভাবে ভাষা আন্দোলন করেছিলাম, এ দেশের হাজার হাজার ভাষা শহীদেরা রক্ত ঝড়িয়েছেন ভাষার জন্য। তাদের মূল্যবান ঋণ বহন করে তাদের কতটুকু প্রাপ্য পূরণ করব তা বিচার্য বিষয় হলেও, এটাই সর্বশেষ কথা নয়। আমাদের দায়িত্ববোধ কি শুধুই তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ? শহীদ দিবস এলেই আমরা দায়ভার দায়িত্ব পালন করি- প্রভাত ফেরী, মিনারে পুষ্পস্তবক অথবা স্বরণীয় একটি কবিতা। এটাই কি আমাদের করণীয় ? এ জিজ্ঞাসা সকলের প্রতি রইল।

অঙ্কন ও ফটোগ্রাফি

শাহরিনা চৌধুরী

কাবেরী আক্তার